

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালন প্রভৃতির উৎপাদনকে বোঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশে পতিত ও অব্যবহৃত জায়গাতেও পরিকল্পিতভাবে ফুলফল ও শাকসবজি চাষ করা যায়। এছাড়া শস্যপর্যায় অবলম্বন করে দানা জাতীয় ফসলের পরে সরিষা বা মাসকলাই চাষ, আঁশজাতীয় ফসলের পরে দানা জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে বাঁশ, বেত, পাটকাঠি, খড়, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কাজেই কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- চাষ উপযোগী বিভিন্ন জাতের ফসলের নাম, উৎপাদন পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শাকসবজি চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ও দমন পদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং ফুল-ফল চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছ পালন পদ্ধতি, মাছের রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গৃহপালিত পশুপাখির আবাসন ও পালন পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা এবং গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমষ্টিত চাষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমষ্টিত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- সমষ্টিত চাষ পদ্ধতির মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব এবং সমষ্টিত চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- শিল্পে ব্যবহৃত হয় একুশ কৃষিজ দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং ঔষধি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচেছেন

ফসল ধান পদ্ধতি

আমরা অষ্টম শ্রেণিতে চাষ উপযোগী ফসলের মধ্যে কেবল গম ফসল ধান পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছি। এ পরিচেছেন আমরা ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই এর জাত ও ধান পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

ধান ধান পদ্ধতি

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে ধানের চাষ ও উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ভাত। ধানের ফলন সব জমিতে ভালো হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন বেশি ভালো হয়। মাঝারি উচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এক্টেল ও পলি দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাতসমূহ : বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে। যথা :

ক) স্থানীয় জাত : টেপি, গিরবি, দুখসর, লতিশাইল।

খ) স্থানীয় উন্নতজাত : কটকতারা, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজারশাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

গ) উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত : বাংলাদেশে অনেক জমিতে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। উফশী ধানের জাতগুলোর সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন :

- গাছ মজবুত এবং পাতা খাড়া।
- শীষের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
- গাছ খাটো ও হেলে পড়ে না।
- খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি।
- পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
- অধিক কুশি গজায়।
- সার গ্রহণক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি।

উফশী ধানে যখন প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাগুণ, যেমন- রোগবালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, চিকন চাল, খরা, লবণাক্ততা ও জলমঘ্নতা-সহিষ্ণু ইত্যাদি সংযোজিত হয়, তখন তাকে আধুনিক ধান বলে। তাই সকল উফশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উফশী গুণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (BRRI) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এ পর্যন্ত ধানের উফশী ১০০টি এবং ৭টি হাইব্রিড ধানের জাত উন্নাবন করেছে। ধানের মৌসুম তিনটি। যথা- আউশ, আমন ও বোরো। ত্রি

ধানের কতকগুলো অনুমোদিত জাত আছে যেগুলো আউশ ও বোরো দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। যেমন—
বিআর ১ (চান্দিনা), বি আর ২ (মালা), বিআর ৯ (সুফলা), বিআর ১৪ (গাজী)। আবার বিআর ৩ (বিপ্লব)
জাত সকল মৌসুমে চাষ করা যায়। নিম্নে তিনি মৌসুমের অনুমোদিত জাতগুলোর সংখ্যা ও কিছু জাতের
নাম উল্লেখ করা হলো :

- ক) আউশ মৌসুমের জাত : শুধু আউশ মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ১৩টি। এদের মধ্যে কয়টি
বিআর ২০ (নিজামী), বিআর ২১ (নিয়ামত) ইত্যাদি। এ জাতগুলো আউশ মৌসুমে বগন ও রোপণ
দুইভাবেই আবাদ করা যায়। এ মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ শে চৈত্র এবং চারা রোপণের
জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।
- খ) আমন মৌসুমের জাত : শুধু আমন মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ৪৫টি। এদের কয়েকটি
হলো বিআর ৫ (দুলাভোগ), বিআর ১১ (ঘুঞ্জা), বিআর ২২ (কিরণ), বি ধান ৫৬, বি ধান ৫৭ ও
বি ধান ৬২ ইত্যাদি।
সবগুলো জাতই রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ২৫-৩০
দিন।
- গ) বোরো মৌসুমের জাত : শুধু বোরো মৌসুমেই চাষ করা যায় এরূপ জাত হলো ৩৪টি। এদের কয়েকটি
হলো বিআর ১৮ (শাহজালাল), বি ধান ২৮, বি ধান ২৯, বি ধান ৪৫, বি ধান ৫০ (বাংলামতি), বি
হাইব্রিড ধান ১, বি হাইব্রিড ধান ২ এবং বি হাইব্রিড ধান ৩ ইত্যাদি। রোপণের জন্য চারার বয়স হতে
হবে ৩৫-৪৫ দিন।

এ ছাড়া ধান ফসলের আরও কিছু জাত আছে। যেমন : বৃষ্টিবহুল, খরা-সহিষ্ণু, লবণাক্ত-সহিষ্ণু, হাওর,
ঠাণ্ডা-সহিষ্ণু জাত ইত্যাদি।

বীজ বাছাই : কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজায় এরূপ পরিষ্কার, সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বপনের
জন্য বাছাই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বাছাই করা হয়।

প্রথমে দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩-৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে প্রাপ্ত দ্রবণে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত
দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট ও হালকা বীজগুলো পানির উপর ভেসে
উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে নিলেই পানির নিচ থেকে ভালো বীজ পাওয়া যাবে।
এ বীজগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ধূয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া মেশানো পানি
বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

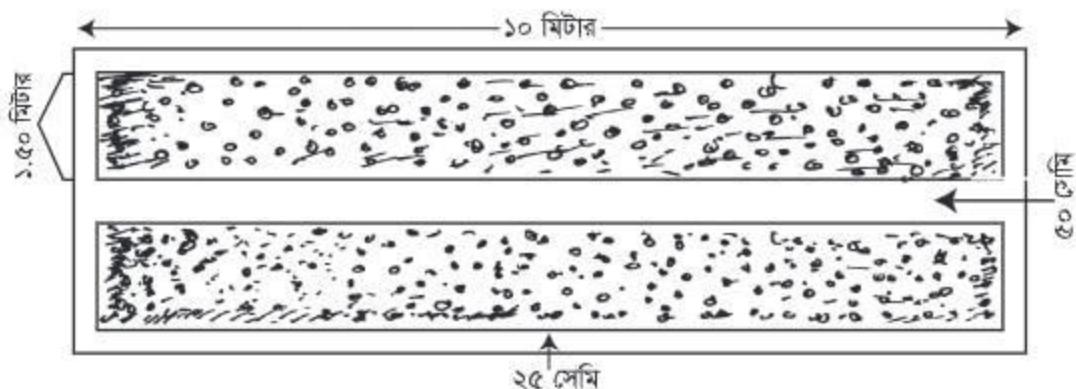
বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া : বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে।
তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ
ভুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম কার্বোক্সিন (17.5%) + থিরাম
(17.5%) দ্বারাও শোধন করা যায়।

শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ঢ্রামে ২-৩ স্তর শুকনো খড় বিহিন্নে তার উপর বীজের ব্যাগ রেখে পুনরায়
২-৩ স্তর শুকনো খড় দিয়ে বা কচুপাতা দিয়ে চেকে ভালোভাবে চেপে তার উপর কোনো ভারী জিনিস দিয়ে
চাপ দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো
মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিনি দিনে ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং সেগুলো বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি : ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথাক্রমে শুকনো বীজতলা খ) ভেজা বীজতলা গ) ভাসমান বীজতলা ঘ) দাপোগ বীজতলা উচ্চ ও দোআঁশ মাটিসম্পন্ন জমিতে শুকনো বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটিসম্পন্ন জমিতে ভেজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো বাতাস থাকে এবং বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ঝুঁকে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে শুকনো ও ভেজা বীজতলা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক) শুকনো বীজতলা : বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি যদি অনুর্বর হয় জমিতে জৈব সার দিতে হবে। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজতলার মাপ : এক শতক জমিতে দুই খণ্ডের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০ মিটার \times ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নালা বাদ দিয়ে ৯.৫ মিটার \times ১.৫ মিটার হবে। বীজ তলার চারদিকে ২৫ সেমি জায়গা বাদ দিতে হবে এবং দুই খণ্ডের মাঝাখালে ৫০ সেমি জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে। বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজ জাগ দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়কাল দরকার। বেমন- আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাণ বীজ উল্লিখিত নিয়মে জাগ দিয়ে অঙ্কুরিত করতে হবে। এরূপ অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।



চিত্র: এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝের জায়গা থেকে মাটি উঠিয়ে দুই বেডে সমানভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। এতে বেডগুলো উচু হয়। এরপর প্রতি বর্গমিটার বেডে ৬০-৮০ গ্রাম বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুই বেডের মাঝে সৃষ্টি নালা সেচ, নিষ্কাশন ও সার বা ঔষধ প্রয়োগের জন্য খুবই দরকার হয়।

খ) ভেজা বীজতলা : এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর জমি আরও ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে বোনা ভালো। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনে বীজতলার মতোই।

বীজতলার পরিচর্যা : পাখি যাতে বীজতলার বীজ খেতে না পারে, সেজন্য বগনের সময় থেকে ৪-৫ দিন পর্যন্ত পাহাড়া দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেড় যাতে শুকিয়ে না যায়, সেজন্য দুই বেডের মাঝের নালায় পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর নালা থেকে প্রয়োজনীয় পানি বেডে সেচ দিতে হয়। বীজ তলায় আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে তা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজতলার চারাগুলো হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারাগুলো সবুজ না হলে গন্ধকের (সালফার) অভাব হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত ঠান্ডায় বীজতলায় চারাগুলো ক্ষতি হতে পারে। তাই রাতে পলিথিন ঢাকা চারাগুলো ঢেকে দিনের বেলায় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চারার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

চারা উঠানো

- ১। চারা তোলার পূর্বে বীজতলায় পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উত্তম। এতে বীজতলার মাটি নরম হয়। ফলে চারা তুলতে সুবিধা হয়।
- ২। ধানের চারা পোকায় আক্রান্ত থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ৩। চারার গোড়া বা কাণ্ড যাতে না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ৪। চারা তোলার পর তা ছেট ছেট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।



চিত্র : বীজতলা থেকে চারা তুলছে

চারা বহন ও সংরক্ষণ : সরাসরি রোপণের ক্ষেত্রে -

- ১। বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড মোড়ানো যাবে না।
- ২। ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করতে হয়।

৩। বস্তাবন্দি করে কখনো ধানের চারা বহন করা যাবে না।

৪। চারা সরাসরি রোপণ সম্ভব না হলে চারার আটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি : ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হবে। এফেতে কোদাল দিয়ে জমির চারদিক ছেঁটে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যিক। গোবর বা আবর্জনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণ করার পর ইউরিয়া সার ও কিস্তিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর, ২য় কিস্তি ৩০-৩৫ দিন পর অর্ধাং চারার গোছায় ৪-৫টি কুশি আসা অবস্থায় এবং শেষ কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর অর্ধাং কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।

নিচে শতক প্রতি জৈব সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারের পরিমাণ দেওয়া হলো :

সারের নাম	পরিমাপ
পচা গোবর বা কমপোস্ট	২০ কেজি
ইউরিয়া	৩৬০-৪৪০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০-৫০০ গ্রাম
এমওপি	১৬০-২৮০ গ্রাম
জিপসাম	২৪০-২৮০ গ্রাম
দস্তা	৪০ গ্রাম

শতকপ্রতি ২০ কেজি পচা গোবর সার বা কমপোস্ট দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা : জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ফেতে আরও কিছু নীতিমালা মেলে চলতে হয়। যেমন : পাহাড়ের পাদভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমওপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।

১। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচেপ্রকল্প এলাকার মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।

২। হাওর এলাকার মাটিতে প্রত্যেক সার কম পরিমাণে দিতে হবে।

৩। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ : সমান করা সমতল জমিতে জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। জমিতে হিপছিপে পানি রেখে দড়ির সাহায্যে সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং সারিতে এক গোছা থেকে অন্য গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি হওয়া দরকার। প্রতি গোছায় ২-৩ টি চারা রোপণ করতে হবে। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

ক) সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং চালু হলে আইলবন্ড মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। বোরো ধান সম্পূর্ণভাবে সেচের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ৫-৭ সেমির নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সেমির নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সেমি সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সেমি এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি পরিমাণ পানি সেচ দেওয়া উভয়। খোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আগাছা দমন : কমপক্ষে তিন বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়। যেমন :

- চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে
- প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে
- খোড় বের হওয়ার পূর্বে।

ধানক্ষেতে সাধারণত আরাইল, গাইচা, শ্যামা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়। এগুলো সরাসরি হাত/নিড়ানি দ্বারা ও ঔষধ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

গ) পোকা দমন : ধানক্ষেতে অনেক পোকার উপদ্রব হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সাধারণত ধান ফসলে মাজরা পোকা, পামরি পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, গাঢ়ি পোকা, গল মাছি, শীষকাটা লেদা পোকা প্রভৃতি দেখা যায়।

নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র: মাজরা পোকা মথ



চিত্র: পামরি পোকা



চিত্র: গাঢ়ি পোকা

নিম্নলিখিত তালিকায় পোকার আক্রমণের লক্ষণসমূহ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করা যায়।

তালিকা ১

পোকার নাম	আক্রমণের লক্ষণসমূহ
১. মাজরা পোকা	১) ধান গাছের মাঝেড়গা ও শীষের ক্ষতি করে, ২) কৃশি অবস্থার আক্রমণ করলে মাঝেড়গা সাদা হয়ে যায়, ৩) ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীষে সাদা চিটা হয়, ৪) সব খাতুতেই কমবেশি আক্রমণ করে।
২. পামরি পোকা	১) পামরি পোকার কীড়া পাতার ভিতরে ছিদ্র করে সবুজ অংশ খায়। ২) পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ খুঁড়ে খুঁড়ে খায় বলে পাতা সাদা হয়ে যায়।
৩. গলমাছি	১) গল মাছির কীড়া ধানগাছের বাড়ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পিঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ২) কুশিতে শীষ হয় না।
৪. গাঙ্কি পোকা	১) গাঙ্কি পোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। ২) বয়স্ক পোকার গা থেকে গুঁক বের হয়।
৫. বাদামি গাছ ফড়ি	১) ধানের গোড়ায় বসে রস চুয়ে যায়, ২) গাছ পুড়ে বাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায়, একে হপার বার্ন বলে।

তালিকা ২

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গাঙ্কি পোকা, পামরি পোকা, মাজরা পোকা, গলমাছি, ছাতরা পোকা, চুঙ্গী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা,	ক্লোরোপাইরিফস ৫০ বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ বা ফেনিন্ট্রাথিয়ন ৫৭ বা ডায়াজিনল ৬০
বাদামি গাছ ফড়ি	কার্বোফুরান ৩ জি/ ১০জি বা ডায়াজিনল ১৪
শীষকাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০

রোগ দমন : ধানগাছের অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ।
নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণসমূহ	দমনপদ্ধতি
১. ব্লাস্ট রোগ	ছত্রাক	১) পাতায় ডিস্চার্ক্টির দাগ পড়ে। ২) দাগের চারদিকে গাঢ় বাদামি এবং মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণের হয়। ৩) অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ পাতা মরে যায়।	১) নীরোগ বীজ ব্যবহার করা। ২) পটাশ জাতীয় সার উপরি প্রয়োগ করা। ৩) বীজ শোধন করে বোনা। ৪) জমিতে পানি ধরে রাখা। ৫) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা। ৬) রোগ প্রতিরোধ জাত বিআরও, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিআর ১৬, বিআর ২৪, বি ধান ২৮ রোপণ করা।
২. টুংরো রোগ	ভাইরাস	১) চারা রোপণের এক মাসের মধ্যে টুংরো রোগ দেখা দিতে পারে। ২) আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ, পরে আস্তে আস্তে হলদে হয়ে যায়। ৩) গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। ৪) কুশি হয় না। ৫) প্রথমে দুই-একটি গোছায় এ রোগটি দেখা যায়, পরে ধীরে ধীরে আশেপাশের গোছায় ছড়িয়ে পড়ে।	১) পাতা ফড়িং এ রোগ ছাড়ায়, তাই পাতা ফড়িং দমন করতে হবে। ২) রোগ প্রতিরোধীজাত যেমন- চান্দিনা, দুলাভোগ, বি শাইল, গাজী, বিআর ১৬, বিআর ২২, বি ধান ৩৭, বি ধান ৩৯, বি ধান ৪১, বি ধান ৪২ চাষ করা। ৩) আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলা। ৪) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা। ৭) ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি স্প্রে করা।

এছাড়া ধান ফসলে পাতা পোড়া রোগ, উফরা রোগ, খোল পোড়া রোগ, বাকানি রোগ, বাদামি দাগ রোগ, খোলপচা রোগ, স্মাট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে ধান ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করতে বলবেন। একেতে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

ফসল কর্তন, মাড়াই ও সহরক্ষণ

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝারে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়, শীষকাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শীষের উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং নিচের অংশের ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা দরকার। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াইয়ের পর ধান ৩-৪ দিন পূর্ণ রোদে শুকাতে

হবে। এবার ভালোভাবে কুলাদিয়ে রেতে সংরক্ষণ করতে হবে। যে পাত্রে ধান রাখা হবে তা পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় নিম্ন/নিশিন্দা/বিষকাটালীর পাতা (গুঁড়া) মিশিয়ে দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। তারপর পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না ঢুকে।

ফলন

আউশের চেয়ে আমনের, আবার আমনের চেয়ে বোরোর ফলন বেশি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি হয়ে থাকে। উফশী জাতের ধানের হেষ্টেরথতি ফলন ৫-৬ টন এবং শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ২০-২৪ কেজি।

কাজ : শিফ়ার্থাদের প্রত্যেককে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধান ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

পাট চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে ব্রহ্মপুর, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও পাট জন্মে। পাটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে উঠেছে।

জমি নির্বাচন : উর্বর দোআশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বর্ধার শেবের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোষা পাট উচ্চ জমিতে এবং দেশি পাট উচ্চ ও নিচু দুই ধরনের জমিতেই চাষ করা যায়।

চাষ উপযোগী পাটের জাতসমূহ : প্রত্যেকটি ফসলের এমন অনেক জাত আছে, যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পুষ্টিমান, খাদ্যাণুণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গুণাবলি বিদ্যমান। তবে একই জাতে সব বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট (BJRI) ১৭টি দেশি, ১৬টি তোষা বা বগী পাট, ২টি কেনাফ এবং ১টি মেষ্টা জাতের পাট উন্নাবন ও অবমুক্ত করেছে।

দেশি পাটের জাতসমূহ : সিভিএল-১ (সবুজপাট), সিভিই-৩ (আঙ পাট), সি সি-৪৫ (জো পাট), ডি-১৫৪, এটিম পাট-৩৮ ইত্যাদি দেশি পাটের জাত।

তোষা বা বগী পাটের জাতসমূহ : ও-৪, ও-৯৮৯৭ (ফালুনি তোষা), সিজি (চিন সুরা প্রিন) ইত্যাদি তোষা বা বগী পাটের জাত।

কেনাফ জাতসমূহ : এইচ সি-২ (জলি কেনাফ), এইচ সি-৯৫

মেষ্টাজাত : এইচ এস-২৪ (টানী মেষ্টা)

জমিচাষ : ফালুন-চেত্র মাসে দুইএক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। রবি ফসল তোলার পর পরই জমি চাষ করা উচিত। ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটির চেলা ভেঙে

সমান করতে হবে। পাটের বীজ ছোট বলে মাটির দলা ভেঙে মিহি করতে হবে এবং আগাছা থাকলে বা পূর্ববর্তী ফসলের শিকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নতুন বীজ আশানুরূপ গজাবে না।

সার প্রয়োগ : পাটের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাণমতো জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে পাটের ফলন সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। পাটের জমিতে সঠিক নিয়মে জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার পরিমাণে কম লাগবে। তবে মাটিতে দস্তা ও গঁককের অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পর সার প্রয়োগ : জমি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ও-৯৮৯৭ জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় শতক প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ও-৯৮৯৭ জাতের বেলায় শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কিছু পরিমাণ শুকনো মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে ‘হো’ বা নিড়ানি যত্নের সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন গাছের কচি পাতা ও ডগায় প্রয়োগকৃত সার না লাগে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে।

বীজ শোধন : বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেওয়া উচ্চ। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে রিডোমিল বা ক্যাপটান ৭৫% বালাইনশক মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া উচিত।

বীজ বপনের সময় : সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুনলে গাছে অসময়ে ফুল আসে এবং ফলন কম হয়, পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাতভেদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি ও বীজ হার : জমিতে পাট বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে এ দুই উপায়ে বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০ সেমি আবার ছিটানো পদ্ধতিতে বুনলে বীজ বেশি লাগবে। বীজ যেন মাটির খুব গভীরে বোনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে ‘জো’ আসলে বীজ বুনতে হবে।

বীজ বপনের পর পরিচর্যা

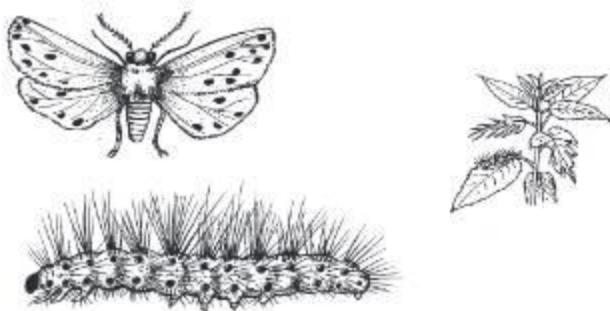
চারা পাতলা করণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ঘন চারা থেকে দুর্বল চারাগুলো উঠিয়ে এবং সাথে সাথে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয় বার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে এবং শেষবার ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা : পাটের জমিতে খরাদেখা দিলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে তাকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড় দমন : পাট ফেতে বিছা পোকা, উরচুদা, চেলে পোকা, ঘোড়া পোকা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি পোকার নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) বিছা পোকা

লক্ষণ : কচি ও বয়স্ক সব পাতাই খেয়ে ফেলে। স্তৰি মধ্য পাটের পাতার উল্টা পিঠে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাচ্চাগুলো পাতার উল্টা দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে। পরে এরা সব গাছে ছড়িয়ে পড়ে। দলবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ থেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মতো করে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতাগুলো দূর থেকেই সহজে দৃশ্যমান হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি ডগাও থেয়ে ফেলে।



চিত্র : বিছা পোকা ও পাটগাছ।

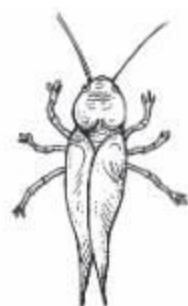
দমন পদ্ধতি

- পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে গাদাসহ পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন ডিম থেকে বের হওয়া কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে, তখন পোকাসহ পাতাটি তুলে পায়ে পিষে, গর্তে চাপা দিয়ে অথবা অঞ্চল কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।
- পাট কাটার পর শুকনো জমি চাষ করলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা পুতলিগুলো বের হয়ে আসে যা পোকাখাদক পাখি খেয়ে ফেলে।
- বিছা পোকা যাতে আক্রমণ ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে ছাড়াতে না পারে সেজন্য আক্রমণ ক্ষেত্রের চারদিকে প্রতিবন্ধক নালা তৈরি করে অঞ্চল কেরোসিন মিশ্রিত পানি নালায় রাখতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) উরচুঙা

লক্ষণ

জমিতে গর্ত করে দিনের বেলায় গর্তে বসবাস করে এবং সন্ধ্যাবেলায় গর্ত থেকে বের হয়ে চারা পাটগাছের গোড়া কেটে গর্তে নিয়ে যায়। এতে পাটক্ষেত মাঝে মাঝে গাছশূন্য হয়ে যায়। অনাবৃষ্টির সময় আক্রমণ বেশি হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতার পর আক্রমণ কমে যায়। পূর্ণবয়স্ক পোকা পাট গাছের শিকড় ও কান্দের গোড়ার অংশ খায়।



উরচুঙা

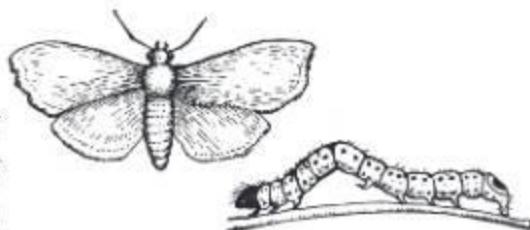
দমন পদ্ধতি

- প্রতিবছর যেসব জমিতে উরচুঙার আক্রমণ দেখা যায় সেখানে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি করে বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে চারা ৮-৯ সেমি ইওয়ার পর ঘন গাছ বাছাই করে পাতলা করতে হবে।
- সন্তুষ্ট হলে নিকটস্থ জলাশয় থেকে আক্রান্ত জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমি চাষের সময় নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্তে কীটনাশক প্রয়োগ করে।
- কীটনাশক, বালাইনাশকের বিষটোপ প্রয়োগ করে।

গ) ঘোড়া পোকা

লক্ষণ

ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমণ করে। ফলে কচি ডগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। ফলে পাটের ফলন ও আঁশের মান কমে যায়।



চিত্র : ঘোড়া পোকা

দমন পদ্ধতি

- পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন ভেজা দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- শালিক বা ময়না পাখি ঘোড়া পোকা থেতে পছন্দ করে। তাই এসব পাখি বসার জন্য পাটক্ষেতে বাঁশের কঞ্চিৎ এবং গাছের ডাল পুঁতে দিতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

ঘ) চেলে পোকা

লক্ষণ

ঞী পোকা চারা গাছের ডগায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা গাছের ভিতরে চলে যায় এবং সেখানে বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মরে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। গাছ বড় হলে পাতার গোড়ায় কানের উপর ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ফলে ঐ জায়গায় গিটের সৃষ্টি হয়। পাট পচানোর সময় ঐ গিটগুলো পচেনা। আঁশের উপর কালো দাগ থেকে যায়। এতে আঁশের মান ও দাম কমে যায়।



চিত্র : চেলে পোকা

দমন পদ্ধতি

- বীজ বপনের আগে ও পাট কাটার পরে ফেতের আশে পাশে যেসব আগাছা থাকে, সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত পাট গাছগুলো তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- গাছের উচ্চতা ৫-৬ সেমি লম্বা হওয়ার পর নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) মাকড়

পাটক্ষেতে দুই ধরনের মাকড় দেখা যায়। যথা- হলদে ও লাল মাকড়।

লক্ষণ

হলদে মাকড় কচি পাতায় আক্রমণ করে পাতার রস চুম্বে থায়। এতে কচি পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং পাতার রং তামাটে হয়ে যায়। হলদে মাকড় ফুলের কুঁড়িকেও আক্রমণ করে। ফলে কুঁড়ি ফুটতে পারে না। ফুলের পাপড়ির রং হলদে থেকে কালচে রঙের হয়ে যায় ও ঝারে পড়ে। এতে বীজের ফলনও কমে যায়। একটানা খরা বা অনাবৃষ্টির সময় এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। লাল মাকড় একটু নিচের পাতা আক্রমণ করে।



চিত্র : লাল মাকড়

দমন পদ্ধতি

- চুন ও গুৰুক ১:২ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত পাটক্ষেতে ছিটাতে হবে।
- কাঁচা নিমপাতার রস ২:৫ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

রোগ দমন : পাটে কাণ্ড পচা, কালোপষ্টি, গোড়া পচা, শুকনা ক্ষত, চলে পড়া, ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

- ক) কাণ্ড পচা রোগ :** লক্ষণ : পাতা ও কাণ্ডে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোনো অংশে দেখা দিতে পারে। দাগগুলোতে অসংখ্য কালো বিন্দু দেখা যায়। এ কালো বিন্দুগুলোতে ছত্রাক জীবাণু থাকে। কখনো কখনো আক্রান্ত স্থানে গোটা গাছই ভেঙে পড়ে। কেনাফ ও মেংতা পাটে এ রোগ দেখা দিতে পারে।
- খ) কালো পষ্টিরোগ :** এ রোগের লক্ষণ প্রায় কাণ্ড পচা রোগের মতোই। তবে এতে কাণ্ডে কালো রঙের বেষ্টনীর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থানে ঘষলে হাতে কালো ঝঁড়ার মতো দাগ লাগে। এ রোগে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।
- গ) শুকনা ক্ষত :** এ রোগটি শুধু দেশি জাতের পাটেই দেখা যায়। চারা অবস্থায় আক্রমণ করলে চারা মারা যায়। বড় গাছের কাণ্ডে কালচে দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় এবং ক্ষতস্থানে জীবাণু সৃষ্টি হয়। এ জীবাণুগুলো বাতাসে উড়ে ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফল কালো ও আকারে হেঁট হয়। এ রোগে গাছ মরে না, তবে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়। তাই পাট পচানোর পরেও আক্রান্ত স্থানের ছাল পাট কাঠির সাথে লেগে থাকে। এর আঁশ নিম্নমানের হয়।

প্রতিকার/দমনব্যবস্থা : কাণ্ড পচা, কালোপষ্টি ও শুকনা ক্ষত এ তিনটি রোগই বীজ, মাটি ও বায়ুবাহী। এদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও একই রকমের। যেমন :

- পাট কাটার পর জমির আগাছা, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত গাছের গোড়া উপড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হবে।
- নীরোগ পাট গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমি থেকে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

পাট-কাটা ও আঁটি বাঁধা

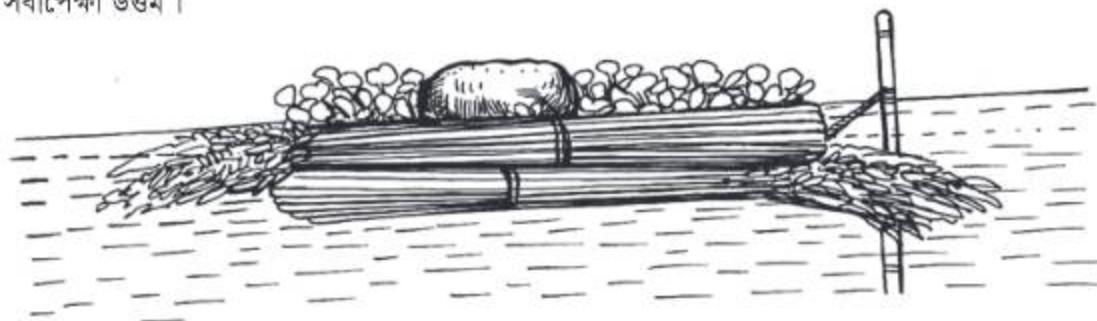
সঠিক সময়ে পাট না কাটলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আবাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ-ভদ্র মাসে তোষা পাট কাটতে হয়। গাছে ফুল আসলে বুরতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। তাই পাট গাছ কাটার পরই এ সমস্ত গাছকে আলাদা করে ধ্রায় ১০ কেজি ওজনের আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার পর সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমিতেই স্তুপ করে রাখলে গাছের পাতাগুলো বারে যাবে। পাতাগুলো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাটের পাতা ভালো সার।



চিত্র : পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা।

পাট জাগ দেওয়া

প্রথমে ১০-১৫টি আঁটি একদিকে গোড়া রেখে তারপর উল্টা দিকে গোড়া রেখে আরও আঁটি পানির উপর সাজাতে হবে একেই পাটের জাগ বলে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপর ৩০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০টি আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পচে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়। পাট জাগ দেওয়ার জন্য বিল, খাল বা নদীর মৃদু স্নোতযুক্ত পরিকার পানি সর্বাপেক্ষা উন্নত।



চিত্র : পাট জাগ দেওয়া।

জাগ ডুবানোর জন্য মাটির চেলা, কলাগাছ, আমগাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে আঁশের রং কালো হয়। বাঁশের খুটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে, কিংবা পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে জাগ ডুবানো যায়। জাগ চাকার জন্য কচুরিপানা, ধানের খড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাট পচনের সময় নির্ধারণ

পাট গাছের আঁটি পানিতে ডুবানোর ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে যদি সহজে ছাল তথা আঁশ পৃথক করা যায় তবে বুঝতে হবে পাট গাছের পচন শেষ হয়েছে। গরম আবহাওয়ায় ১২-১৪ দিন এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ২০-২৫ দিনের মধ্যেই পাট পচে যায়।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিকারকরণ

পচার পর গাছ থেকে দুইভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়। যথা-

- ১) পানি থেকে প্রতিটি আঁটি উঠিয়ে এবং শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি গাছ থেকে আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কতকগুলো পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধূয়ে নেওয়া হয়।
- ২) হাঁটু বা কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুণ্ডুর দ্বারা পিটানো হয়। পরে গোড়ার অংশ হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অঞ্চলগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধূয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে প্রথম সূর্যালোকে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেওয়ার পর সুন্দর করে আঁটি বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশি পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়।

বাংলাদেশের পাট ফসলের গুরুত্ব

পাট একটি আঁশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্ধকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে সোনালি আঁশ বলে অভিহিত করা হয়। পাট ফসলটি যে সময়ে জন্মায় সে সময় বৃষ্টি থাকে। তাই সেচের দরকার হয় না। পাট ফসলটি খরা ও জলাবদ্ধতা দুটোই সহ্য করতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের যেসব এলাকায় সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং যেখানে যে মাস থেকে সেচের মাস পর্যন্ত জমিতে পানি জমে থাকে, সেখানে ধানের চেয়ে পাট চাষ বেশি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার হেক্টের জমি আছে, যেখানে এঙ্গিল থেকে সেচের পর্যন্ত শুধু পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল চাষ সম্ভব নয়। খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে পাট অন্যান্য ফসলের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে দেশি ও তোষা এ দুই জাতের পাটের চাষ হয়। তবে দেশি জাতের তুলনায় তোষা জাতের পাটের চাষ বর্তমানে বেশি হচ্ছে। এর কারণ হলো পূর্বে যে সব এলাকায় দেশি পাটের চাষ হতো, তা ছিল নিচু এলাকা। বর্তমানে খাদ্য শস্যের চাহিদার জন্য ঐ সমস্ত এলাকা ধান চাষের আওতায় চলে গেছে। পাট চলে গেছে তুলনামূলকভাবে উচু ভূমি এলাকায় যেখানে বৃষ্টি নির্ভরতা বেশি। যাহোক, পাট ফসল শুধু আঁশ হিসাবেই নয়, কৃষিজাত শিল্পে, ঔষধি শিল্পে, পরিবেশ সংরক্ষণে ও সবজি হিসাবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ : শিঙ্কার্থীরা অর্থনৈতিক উভয়নে পাট ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।

সরিষার চাষ

বাংলাদেশে তেল ফসল হিসাবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এ দেশের মানুষ সরিষাকেই প্রধান ভোজ্য তেল বীজ ফসল হিসাবে বেশি চাষ করে থাকে।

নিম্নে সরিষা চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

জমি নির্বাচন

সরিষা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ অথবা পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতএব, সহজে পানি নিকাশ করা যায় এবং বেলে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচন

অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিম্নে সরিষার অনুমোদিত কতকগুলো জাতের নাম, যেমন- টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, সম্পদ, রাই সরিষা, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬।

বপনের সময়

বাংলাদেশে সরিষা শীতকালীন ফসল। বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্য আশ্চর্ষিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস (অক্টোবর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৬ এর বীজ আশ্চর্ষিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

জমি তৈরি

জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী মাটির 'জো' অবস্থায় ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করতে হবে। সরিষার বীজ ছেট বিধায় ঢেলা ভেঙে মই দিয়ে মাটি সমান ও মিহি করতে হবে। জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রয়োজনে সেচ এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সরিষার জমিতে কম্পোস্ট সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট, বোরাক্স/বোরিক এসিড ইত্যাদি সার সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারের অর্দেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্দেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজের হার

সরিষার জাত টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর জন্য প্রতি শতকে ২৮-৩২ গ্রাম বীজ লাগে।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছেট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর ঘেকোনো একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ



চিত্র : ফুল ও বীজ সহ সরিষা গাছের ডাগ

ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোনো জায়গায় গাছ ঘন এবং কোনো জায়গায় পাতলা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সারি করে সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সেমি রাখা হয় ও প্রতি সারিতে ৪-৫ সেমি দূরত্বে এবং ২-৪ সেমি গভীরতায় বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাণ রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সরিষা ফসলের ক্ষেত্রে পরিদর্শন করবে এবং সরিষা ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দেবে।

পরিচর্যা

সরিষার জমিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিচর্যা করা হয়।

- ১) **পানিসেচ :** মাটির আর্দ্রতা পর্যাণ থাকলে সরিষার জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতা বুরো ২-৩ টি সেচ দিলে বেশ ভালো ফলন হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ গাছে ফল হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের পূর্বে যদি মাটি শুক্র থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।
- ২) **গাছ পাতলাকরণ :** চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। জমির কোথাও চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।
- ৩) **আগাছা দমন :** সরিষার জমিতে আগাছা দেখা মাত্র নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আগাছা দমন করা যায়। যেসব জমিতে অরোবাংকির আক্রমণ দেখা যায়, সেসব জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাব না করাই ভালো।
- ৪) **রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন :** সরিষা ফসলের প্রধান রোগ অল্টারনারিয়া ব্রাইট বা পাতায় দাগ পড়া রোগ অন্যতম। এ রোগ দেখা দিলে গাছের পাতায় প্রথমে বাদামি পরে গাঢ় রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষণ করতে হলে প্রতিরোধ হিসাবে সঠিক নিয়মে বপন করা দরকার।
- ৫) **পোকা মাকড় দমন :** সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাবপোকা। বাচ্চা ও পরিণত জাবপোকা সরিষার কাণ্ড, পাতা, পুষ্পমঞ্চারি, ফুল ও ফল থেকে রস চুর্যে থায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফল কুঁচকে ছেট হয়ে যায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি মাসে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে সিঞ্চন যত্রের সাহায্যে সরিষার ক্ষেত্রে ছিটাতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ সরিষার ফল খড়ের রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা হলদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উচ্চম। মূলসহ গাছ টেনে তুলে অথবা কাঁচির ঘারা কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে টেনে তোলাই ভালো।

ফসল মাড়াই

ফসল সংগ্রহের পর ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। কিছু কিছু অপুষ্ট বীজ থাকতে পারে। অপুষ্ট বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

মাড়াই করার পর বীজ বোঝে রোদে ভালোভাবে ৩-৪ দিন শুকিয়ে নেওয়ার পর শুক পাত্রে সংরক্ষণ করা উচ্চম। সংরক্ষিত বীজ মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়। রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিক পাত্রে, ঢিনে বা ঢ্রামে রেখে মুখ ভালোভাবে বন্দ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে।

ফলন

বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি শতকে প্রায় ৩ থেকে ৩.৫ কেজি।

সরিষা ফসলের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ৩ থকার সরিষার চাষ হয়। যথা- টরি, শ্বেত ও রাই। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৪০% আমিষ এবং ৬৪% নাইট্রোজেন থাকে। সরিষার খৈল গরু, মহিষের জন্য খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট জৈব সার। এছাড়া রান্নার কাজে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উৎসিদ্ধ বলা হয়। কাজেই অর্থনৈতিক, ঔষধশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সরিষা ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিঙ্কাশীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরিষা ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।

মাসকলাই চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের ছান চতুর্থ। দেশে মোট উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকলাই একটি শক্ত ও খরা-সহিষ্ণু ফসল, যা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ডাল হিসাবে ছাড়াও এটি কাঁচাগাছ অবস্থায় পশ্চিমাদ্য ও সবুজ সার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কাজেই ডাল ফসল হিসাবে মাসকলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা মাসকলাই এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

জমি নির্বাচন

সুনিকাশিত দোআঁশ ও বেলেদোআঁশ মাটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। উচু থেকে নিচু সব ধরনের জমিতে মাসকলাই চাষ করা যায় যদি পানি জমে থাকার আশঙ্কা না থাকে। মাসকলাই উষ্ণ ও শুকনো জলবায়ুর ফসল।



চিত্র : মাসকলাই

জাতসমূহ

বাংলাদেশে চাষকৃত মাসকলাইয়ের বেশ কিছু উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। নিচে মাসকলাই এর কয়েকটি জাতের নাম দেওয়া হলো :

- ক) উকশী জাত : পাত্র, শরৎ, হেমন্ত, বিনা মাস-১, বিনা মাস-২
- খ) স্থানীয় জাত : রাজশাহী, সাবুহাটি

জমি তৈরি

মাসকলাই চাষের জন্যে খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময়

মাসকলাই বীজ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

বীজ হার : নিচে মাসকলাই চাষের জন্য বীজ হার দেওয়া হলো :

উদ্দেশ্য	বপন পদ্ধতি	বীজ হার (গ্রাম/শতক)
বীজের জন্য	ছিটিয়ে	১৪০-১৬০
	সারিতে	১০০-১২০
পশ্চিমান্তর্য বা সবুজ সারের জন্য	ছিটিয়ে	২০০-২৪০

বীজ বপন পদ্ধতি

মাসকলাইয়ের বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করা যায়। তবে বীজের জন্য সারিতে বপন করা ভালো। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হয়। সারিতে বীজগুলো অবিরতভাবে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ বপন করা হয়। ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ শোধন

বীজ বাহিত রোগ দমনের জন্য বীজ শোধন করে বপন করা দরকার।

সার ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই চাষে হেষ্টের প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	১৬০-১৮০
টিএসপি	৩৪০-৩৮০
এমওপি	১২০-১৬০
অণুবীজ সার	১৬-২০

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে। জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের দরকার হয় না। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ সার প্রয়োগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ মাসকলাই ফসলের ক্ষেত্র পরিদর্শন করবে এবং মাসকলাই ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দেবে।

অর্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

- চারা গজানোর পরে আগাছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বপনের পর জমিতে রসের পরিমাণ কম বা অভাব হলে হালকা সেচ দিতে হবে।
- দেচের পর ‘জো’ অবস্থায় মাটির উপরের শক্ত স্তর ভেঙে দিতে হবে।
- ফসলের জমিতে পোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক) মাসকলাইয়ের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

সারকোস্পোরা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। অধিক আর্দ্ধতা ও উচ্চতাপে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিখাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের কোষসমূহ শুকিয়ে যায় এবং পাতা ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধী জাতের (গাঢ়, শরৎ ও হেমন্ত) মাসকলাই চাষ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত শুক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা যায়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

পাতার উপর পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। হাতে স্পর্শ করলে পাউডারের গুঁড়ার মতো লাগে।

প্রতিকার

বিকল্প পোষক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। টিষ্ট বা থিওভিট প্রয়োগ করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে ব্যবহার করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ ও বিস্তার

মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

রোগের লক্ষণ

কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

প্রতিকার

রোগমুক্ত বীজ বগন করতে হবে। সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে। আক্রমণ গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শস্য পর্যায় অবস্থন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকলাইয়ের চাষ করতে হবে।

পোকা ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই ফসলে বিছা পোকার দ্বারা আক্রমণ হয়ে থাকে। এ পোকা পাতা, অপরিপক্ত সবুজ ফলের রস খেয়ে ফেলে। পাতাসহ সমস্ত গাছ সাদা জালিকার মতো হয়ে যায়। ফলে ফলন কমে যায়। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে হাত দ্বারা সেগুলোকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে পরিমাণ মতো সাইপারমেট্রিন ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া গুদামজাত মাসকলাই ডাল পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপোয়ুক্ত হয়ে পড়ে। গুদামজাত করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দানা শুকিয়ে দানার আর্দ্রতা ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টনপ্রতি ৩০০ থাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন শতকরা ১০ ভাগ গুড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ

খরিপ-১ মৌসুমে মে মাসের শেষ এবং খরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ত হলে সকালের দিকে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একবার বা ২-৩ বার ফসল সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম দিকে পরিপক্ত ফল হাত দিয়ে এবং শেষবারের বেলায় কাঁচি দিয়ে গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিরে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হবে।

ফলন

জাত ভেদে মাসকলাইয়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই ফসলের পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

দ্বিতীয় পরিচেছন

শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

আমরা শাকসবজি প্রতিনিয়তই ফসলের জমিতে, বাগানে, হাটে বাজারে দেখতে পাই। আমরা এগুলো নিজের জমি থেকে বা বাজার থেকে সংগ্রহ করে শাকসবজির চাহিদা পূরণ করে থাকি। এবার আমরা এসব শাকসবজির চাষ সম্পর্কে জানব। তবে চাষ পদ্ধতি জানার আগে শাকসবজির গুরুত্ব ও শাকসবজি চাষের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

১) শাকসবজির গুরুত্ব

শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করে একদিকে পারিবারিকভাবে চাহিদা মেটানো যায় এবং অন্যদিকে উন্নতগুলো বিক্রি করে বাড়ি আয়ও করা যায়। কাজেই খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ ও অর্থকরী ফসল হিসাবে শাকসবজি চাষ করা খুবই জনুরি।



চিত্র : বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি।

খাদ্য হিসাবে শাকসবজি

১.১. খাদ্য মান হিসাবে : শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি থাকে। এ ছাড়া আমিষ, ক্যালরি ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসাবেও শাকসবজির গুরুত্ব অনেক।

১.২. ভেজ গুণাঙ্গ হিসাবে শাকসবজি : শাকসবজির ভেজ গুণাঙ্গ হিসাবে অনেক অবদান রয়েছে। যেমন- শশা হজমে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার কাজ করে। রসুনে বাত রোগ সারে ইত্যাদি।

১.৩. অর্থনৈতিক দিক থেকে শাকসবজি : মানবদেহের জন্য শাকসবজি অত্যাবশ্যক। সুস্থি ও সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে কমপক্ষে ৪০০ গ্রাম শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই শাকসবজি উৎপাদনে একদিকে পরিবারের চাহিদা মেটানো যায়, অন্যদিকে এগুলো বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। শাকসবজি চাষ করে পাতিত জমির ব্যবহার করা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে এবং মহিলা ও পারিবারিক শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ ।

২. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অসংখ্য উক্তি শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজির চাষাবাদ হয়। উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে এসব শাকসবজিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথ-

(১) শীতকালীন শাকসবজি (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (৩) বারমাসি শাকসবজি। যেমন :

শীতকালীন সবজি : টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, গাজর ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন সবজি : করলা, বিঞ্চা, পটল, ধুন্দুল, পুইশাক ইত্যাদি।

বারমাসি সবজি : বেগুন, টেক্স, পেঁপে, কাঁচকলা ইত্যাদি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শীত, গ্রীষ্ম ও বারমাসি শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

শিম, টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। বর্তমানে দুই একটি জাত বের হয়েছে, যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। গিমা কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং খিরা মিলিয়ে শসা জাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায়। তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

৩. শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন শাকসবজির নাম এবং কোনগুলো কোন মৌসুমে জন্মায় তা জেনেছি। এবার শাকসবজি উৎপাদনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে জেনে নিই।

কোনো ফসল তথা শাকসবজি চাষ বা উৎপাদন করার পূর্বে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তালো বীজ, বীজতলার জমি নির্বাচন ও তৈরি, বীজ বপন ও বীজতলার যত্ন, মূল জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন ও রোপণ, পানি সেচ ও নিকাশ, আগাছা দমন ও মালচিং, পোকামাকড় দমন, রোগ দমন ও সময়মতো ফসল সংগ্রহ।

৪. শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

শাকসবজি চাষাবাদের বেশ কিছু পদ্ধতি দেশে বিদেশে চালু আছে। এগুলোর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি হলো পর্যায়ক্রমিক চাষ পদ্ধতি, মিশ্র ফসল পদ্ধতি, রিলে ফসল পদ্ধতি, ফালি ফসল পদ্ধতি, সারিতে ফসল চাষ পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকটি শাকসবজির চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পালংশাক চাষ

পালংশাক বেশ জনপ্রিয়, পৃষ্ঠিকর ও সুস্বাদু পাতা সবজি। এ সবজি অধিক ভিটামিন সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

পালংশাকের জাত : পুষা জয়ন্তী, কপি পালং, গ্রিন, সবুজ বাংলা ও টকপালং। এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, পুঁপ জ্যোতি ইত্যাদি।



চিত্র : পালংশাক

মাটি

দোআঁশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী। এছাড়াও এঁটেল, বেলে-দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মিহি করে তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

- ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।
- খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আইল নির্বাচন ও তৈরি

জমিতে আইল তৈরি করেও পালংশাক চাষ করা যায়। উচ্চ আইলে কিছুটা আগাম পালংশাক বীজ বপন করা যায়। কোদাল দিয়ে আইলের মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পালংশাকের জমিতে নিয়ম অনুযায়ী গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের হার

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টেরে
৩৫-৪০ গ্রাম	১১৭ গ্রাম	৯-১১ কেজি	২৫-৩০ কেজি

বীজ বপনের সময়

সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি মাস।

বীজ বপনের দূরত্ব

১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়।

অঙ্কুরোদগমের সময়

বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : জমিতে আইলে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে সে চারা রোপণ করেও পালংশাক চাষ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নিদিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং পালংশাক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দেবে।

পরিচর্যা

আগাছা নির্ধন

জমিতে আগাছা দেখা দিলেই তা তুলে ফেলতে হবে।

সার উপরিপ্রয়োগ

সময়মতো নিয়মানুযায়ী সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

এ শাকের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপণের পর হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

শূন্যস্থান পূরণ

কোনো স্থানের চারা মরে গেলে অথবা বীজ না গজালে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপণ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ

গাছের দুট বৃন্দির জন্য মাটিতে বেশি দিন রস ধরে রাখা এবং মাটিতে ধাতে সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবার পানি সেচের পর আইল/জমির উপরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলা করণ

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড়

পালংশাকে মাঝে মাঝে পিপীলিকা, উরচঙ্গা, উইপোকা এবং পাতাছিদ্রবারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

পালংশাকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে- ১) গোড়া পচা রোগ ২) পাতার দাগ রোগ ৩) পাতা ধসা রোগ।

এছাড়া পালংশাকে আরও দুইধরনের রোগ দেখা যায়। যেমন- ডাউনি মিলডিউ, পাতায় গোলাকৃতির দাগ।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বগনের এক মাস পর থেকে পালংশাক সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং গাছে ফুল না আসা পর্যন্ত বেকোনো সময় সংগ্রহ করা যায়।

ফলন

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টেরে
৮-১০ কেজি	২৮-৩৭ কেজি	২৮০০-৩৮০০ কেজি	৭-৯ টন

পুঁইশাক

পুঁইশাক বাংলাদেশের প্রধান গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুঁইশাক সাধারণত বসতবাড়ির আঙিনার বেড়ায় বা মাচায় জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

জাত : পুইশাকের দুইটি জাতের চাষ হয়ে থাকে। যথা- ক) লাল পুইশাক : পাতা ও কাণ্ড লালচে।

খ) সবুজ পুইশাক : পাতা ও কাণ্ড সবুজ।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উন্নীত ২টি জাত আছে। যেমন বারি-১, বারি-২।

জমি তৈরি

সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাস পুইশাক লাগানোর ভালো সময়।

তবে সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্বুন মাস হতেই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপনের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা করে তৈরি করে নিতে হবে। এ সবজি চাষের জন্য উর্বর বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি উভয়।

সার প্রয়োগ

পুইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো। এতে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র : পুইশাক

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

- ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উভয়।
 খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণ

মার্চ-এপ্রিল মাসে পুইশাকের বীজ বপন করতে হয়। বীজ ও শাখা কলম দিয়ে পুইয়ের চাষ করা যায়। তবে বীজ দিয়ে চারা তৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি দূরে দূরে সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। বর্ষার সময় পুইশাকের লতার কিছু অংশ কেটে মাটিতে রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা

নিডানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিডানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পোকামাকড়

এ শাকের ফস্তিকর পোকার মধ্যে শুঁয়োপোকা উল্লেখযোগ্য। এ পোকা গাছের পাতা, কচি ডগা খেয়ে ফস্তি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুইশাকের ডগা লম্বা হতে শুরু করলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কয়েকবার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভালোভাবে চাষ করলে প্রতি শতকে ১৩০-১৫০ কেজি পুইশাকের ফলন পাওয়া যায়।

বেগুন চাষ

বেগুন অতি পরিচিত একটি সবজি। যা সারা বছর পাওয়া যায়। এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসহ অনেক দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

জাত

ইসলামপুরী, শিংলাখ, উভরা, নয়নকাজল, মুক্তকেশী, খটখটিরা, তারাপুরী, নয়নতারা এছাড়া বারি বেগুন - ৬, ৮, ১০, ১২ এবং বিটি বেগুনের জাত রয়েছে উল্লেখযোগ্য। বারমাসী কালো ও সাদা বর্ণের জাত (ডিম বেগুন) রয়েছে। বিদেশি জাতের মধ্যে ব্ল্যাক বিউটি, গ্রেরিডা বিউটি উল্লেখযোগ্য।

বীজ ব্যবহার ও চারা উৎপাদন

বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি শুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য চৈত্র মাস পর্যন্ত বীজ ব্যবহার করা যায়। বালি, কমপোস্ট ও মাটি সম্পরিমাণে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়।

জমি নির্বাচন

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে পানি অপসারণের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এঁটেল ও দোআঁশ মাটিতেও বেগুনের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উচ্চম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে তুলে নিতে হবে। চারাগাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর ৭৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিফ়ার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং বেগুন চাষ পদ্ধতির উপর একটি দলীয় প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।



চিত্র : বেগুনসহ বেগুনগাছ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

পরিচয়

মাটিতে রসের অভাব হলে বা মাটি শকিয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

বেগুনের বালাই ব্যবহারণ

এ দেশে কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির পোকা এবং একটি প্রজাতির মাকড় বেগুন ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা। এই পোকা বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্র করে। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কাটনাশকের যেকোনো একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের বালাই দমন করা যায় -

- ক) কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উইল্টরোগ দমন করা যায়।
- খ) ফেরোমন ও মিষ্টিকুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।
- গ) মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিয়ার খেল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেগুন, টমেটো, শশা, বাঁধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।
- ঘ) সঠিক সময়ে আগাছা দমন ও মালচিং করলে ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।
- ঙ) পোকা প্রতিরোধী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা দমন করা যায়। যেমন- বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারিবেগুন-৫ (নয়নতারা), বারিবেগুন-৬, বারিবেগুন-৭ ইত্যাদি পোকা প্রতিরোধী জাত।
- চ) পোকার আক্রমণমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) সুষম সার ব্যবহার করে।
- জ) শস্যপর্যায় অনুসরণ করে

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। বেগুনের ফল বীজ শক্ত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৩৫০ কেজি বেগুন উৎপন্ন হয়। উন্নরা বেগুন ২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

বিপণন

বেগুন ফসল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা ও খোলা জায়গায় কয়েক দিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বস্তায় বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না। এতে বেগুন তার স্বাভাবিক রং হারাতে পারে এবং পচে যেতে পারে।

কুমড়া চাষ

কুমড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সবজি। এ জাতীয় সবজির কিছু শীতকালীন ও কিছু শীতকালীন জাত আছে, যা বাংলাদেশে জন্মায়। আবার কিছু জাত আছে সারা বছরই সংরক্ষণ করে সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়। কুমড়া জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ প্রধান। আমরা এখন মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ সবজিশুলো সম্পর্কে জানব।

ক) মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভূমিকা

মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কঠি ডগা খাওয়া যায়। মিষ্টিকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাঘী এ তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত।

চাষের সময়

বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ এবং মাঘী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ ঘন সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে গোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১৩০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও দস্তা সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাদার চারপাশে অগভীর একটি নালা কেটে সার নালার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন

মাদা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি বীজ মাদার মাঝখানে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে চারাগাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিঢ়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। গোড়ার কাছাকাছি কিছু খড় ১৫-২০ দিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। ফল ধরা শুরু করলে ফলের নিচেও খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া মাটিতে হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাপাতা বেশি হলে কিছু লতাপাতা ছেঁটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

কুমড়া জাতীয় গাছের বিভিন্ন পোকার মধ্যে লাল পোকা, কাঁটালে পোকা এবং ফলের মাছি উল্লেখযোগ্য। এ পোকা দমনের জন্য সেভিন ডায়াজিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ জাতীয় সবজির রোগের মধ্যে পাউডারি মিঙ্গডিও, ডাউনি মিঙ্গডিও ও এন্থ্রাকলোজ প্রধান। দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াখেল এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

মিষ্টিকুমড়া কঠি অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কঠি অবস্থা থেকেই ফসল সংগ্রহ শুরু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক প্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।



চিত্র : মিষ্টি কুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

খ) চালকুমড়া চাষ

ভূমিকা

গ্রামবাংলায় ঘরের চালে এ সবজি গাছ উঠানে হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাচায় ফলন বেশি হয়। কচি ফল (জালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপন্থ ফল মোরকা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারি কর্তৃক উত্তীবিত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

মাটি

দোআঁশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদা মাটি ছাড়া যেকোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময় : ফেব্রুয়ারি-মে

মাদা তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ করে মই দিয়ে চেলা ভেঙে সমান করতে হবে। জমিতে মাদার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি, প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। একপ পাশাপাশি দুইটি মাদার মাঝখানে

৬০সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে। পারিবারিক বাগানে চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেওয়া হয়।

মাদায় সার প্রয়োগ

প্রতি মাদায় গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

মাদায় গর্ত তৈরি

মিষ্টিকুমড়া চাষের নিয়মের অনুরূপ।

মাদার গর্তে বীজবপন

প্রতি মাদায় সারিতে ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা গজানোর কয়েকদিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি সবল গাছ রাখতে হবে।



চিত্র : চালকুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করে চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়ার চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে জমা দেবে।

পরিচর্যা

মাদা শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধির জন্য মাচা দিতে হবে। মাদার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলের মাছি পোকা, রেড পামকিন বিটল, ইপিল্যাকলা বিটল, লাল মাকড় প্রভৃতি পোকা ফলের ফুতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাউডারি মিলডিও পাতার উপরে সাদা পাউডার এবং ডাউনি মিলডিউ পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রং প্রভৃতি রোগ পাতার ফুতি করে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

লাউ চাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশে লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউয়ের চেয়ে এর শাক বেশি পুষ্টিকর।

লাউয়ের জাত

বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চোখে পড়ে। ফলের আকার-আকৃতি এবং গাছের লতানোর পরিমাণ থেকেও জাতগুলো পার্থক্য করা যায়। যাহোক দেশীয় উন্নত এবং গবেষণালক্ষ কিছু জাতের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ক) দেশীয় জাত : গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ
- খ) উন্নত জাত : বারিলাউ ১, বারিলাউ ২, বারিলাউ ৩, বারিলাউ ৪
- গ) হাইব্রিড জাত : গোলাকার বা লম্বা হালকা সবুজ

মাটি

প্রায় অনেক মাটিতেই লাউ ভালো উৎপাদিত হয়। তবে দোআঁশ মাটিতে লাউয়ের ফলন ভালো হয়। বেলে মাটিতে জৈব পদার্থ ঘোগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে সহজে লাউ চাষ করা যায়।

বীজ বপনের সময়

আগস্ট-নভেম্বর

মাটি তৈরি, মাদা তৈরি, মাদায় সার প্রয়োগ ও মাদায় গর্ত তৈরি প্রভৃতি চালকুমড়া চাষের বর্ণনার অনুরূপ।

বীজ বপন

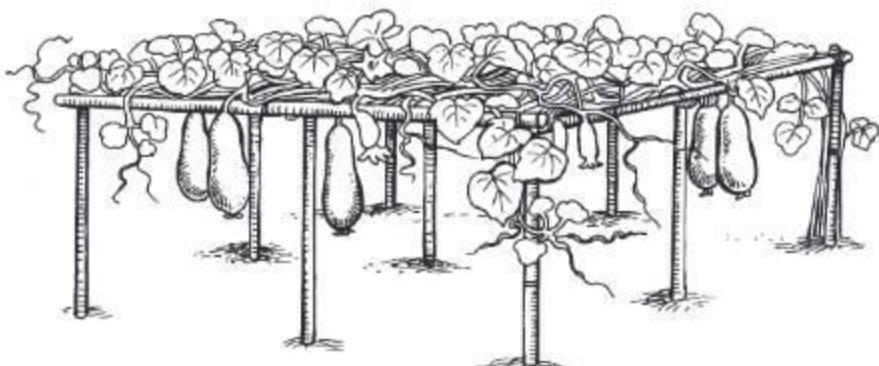
প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হবে।

বাউনি ও মাচা তৈরি

গাছ যথন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা কঢ়িসহ মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

পরিচর্যা

চারা একটু বড় হলে প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে ঝুরঝুরা করতে হবে। প্রতিদিন লাউগাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিতে হবে।



চিত্র : মাচায় লাউসহ লাউগাছ

বালাই ব্যবস্থাপনা

এ সবজিতে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া কিছু প্রজাতির ঘাসের মাধ্যমে লাউয়ের ‘মোজাইক ভাইরাস’ রোগ হতে পারে।

ফসল সংগ্রহ

ফল তোলা বা সংগ্রহ করার উপযুক্ত পর্যায় হবে যখন -

- ফলের গায়ে প্রচুর শুঁড়ের উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নখ দিয়ে ঢাপ দিলে খুব সহজেই নখ ডেবে যাবে।
- পরাগায়ণের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

ফলন

বারি লাউ-১ এবং বারি লাউ-২ চাষ করলে যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৫০-৫৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি/শতক) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

শিম চাষ

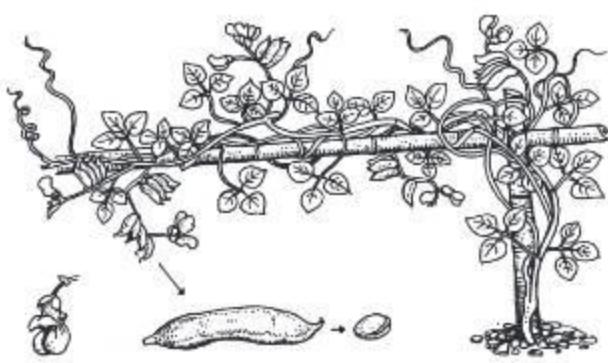
শিম বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। এটি শীতকালীন সবজি।

মাটি

দোআঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। তবে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়।

জাত

বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪, বারি শিম-১০, ইপসা শিম, ঘৃত কাঞ্চন, কার্তিকা, নলডক, বাধনথা, বারমাসি প্রভৃতি শিমের জনপ্রিয় জাত।



চিত্র : শিমসহ শিমগাছ

বীজ বপনের সময় : মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি

বেশি জমিতে আবাদ করলে জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। তবে বসতবাড়ির আশে পাশে, পুরুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে সাধারণত শিমের চাষ করা হয়।

মাদা তৈরি

জমিতে মাদা (গর্ত) $85 \text{ সেমি} \times 85 \text{ সেমি} \times 85 \text{ সেমি}$ আকারে তৈরি করতে হবে। এক মাদা থেকে আরেক মাদার দূরত্ব $2.5-3$ মিটার।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি মাদা পচা আবর্জনা সার দিয়ে পূরণ করতে হবে। তারপর প্রতিটি মাদায় খৈল গুঁড়া, ছাই, টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাদাটি এমনভাবে ভরতে হবে যেন মাটি থেকে ভরাটকৃত মাদার উচ্চতা 10 সেমি হয়। শিম ফসলটিতে নাইট্রোজেন সারের দরকার হয় না। কারণ এটি লিঙ্গম পরিবারের ফসল। এদের শিকড়ে নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে প্রচুর বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

বীজ বপন

সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় $5-6$ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় 2 টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পরিচর্যা

গাছ ঠিকমতো বাড়ার জন্য মাচা দিতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হলে নিড়ানি দিয়ে তা আলগা করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষায় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সে জন্য গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে $15-20$ দিন পর পর $2-3$ কিলোতে 60 গ্রাম টিএসপি ও 60 গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

শিম গাছে জাব পোকা, ত্রিপস, পড় বোরার ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে। জাব পোকা নতুন ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। নিমের বীজের শাস পিষে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এদের দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রমণ গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

জাত ভেদে বীজ বপনের $95-145$ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম উঠানো যায়। বীজ হিসাবে শিম সংগ্রহ করতে শিম যখন গাছে শুকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সংগ্রহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার ও শুক পাত্রে নিমের শুকনা পাতার গুঁড়াসহ সংরক্ষণ করতে হবে।



চিত্র : শিম গাছের জাবপোকা।

জাতভেদে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন- বারি শিম-১ জাতের শিমের বীজ হেক্টরপ্রতি $2-3$ টন ($8-12$ কেজি/শতক) উৎপাদিত হয়। সবজি হিসাবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। আধিন-কার্তিক মাসে শিম ধরে। শিম গাছ 8 মাসেরও বেশি সময় ধরে ফলন দেয়।

<p>কাজ : শিঙ্কার্হীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পালং, পুই, কুমড়া, শিম ও বেগুনের রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে জমা দেবে।</p>

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি

ফুলের চাষ

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ হয় না। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি রাজনীগঙ্গা, গোলাপ ও প্লাটিওলাসের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বেলি, ঝুই, চামেলি, গঙ্গরাজ, অপরাজিতা, শেফালি, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানা ধরনের ফুল জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এসব ফুলের চাষ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। আমরা এবার শুধু গোলাপ ও বেলি ফুল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

গোলাপ চাষ

গোলাপকে ফুলের রানী বলা হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুজাহিমতে গোলাপের চাষ হচ্ছে এবং দিন দিন গোলাপের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোলাপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জাত সমূহ

পৃথিবীজুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি বোপালো, কোনোটি লতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপি এবং মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রানী এলিজাবেথ (গোলাপি), ব্র্যাক প্রিস (কালো), ইরানি (গোলাপি), মিরিস্তা (লাল), দুই রঙে ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়।

বংশবিস্তার

গোলাপের বংশ বিস্তারের জন্য অবস্থাভেদে শাখা কলম, দাবা কলম, গুটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নতুন জাত উৎসাবনের জন্য বীজ উৎপাদন করে তা থেকে চারা তৈরি করা হয়।

জমি নির্বাচন

গোলাপ চাষের জন্য উর্বর দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করা উচ্চম। ছায়াবিহীন উচু জায়গা যেখানে জলাবদ্ধতা হয় না, এরূপ জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে।

জমি তৈরি

নির্বাচিত জমি ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল করতে হবে। এরপর মাটি কুপিয়ে ৫ সেমি উচু করে ৩ মি \times ১ মি আকারের বেড় বা কেয়ারি তৈরি করতে হবে। এভাবে কেয়ারি তৈরির পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ সেমি \times ৬০ সেমি আকারের এবং ৪৫ সেমি গভীর গর্ত খনন করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন আগে গর্ত করে খোলা রাখতে হবে। এ সময়ে গর্তের জীবাণু ও পোকামাকড় মারা যায়।

সার প্রয়োগ

প্রতি গর্তের উপরের মাটির সাথে ছকে প্রদত্ত সারগুলো মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর নিচের মাটির সাথে ৫ কেজি পচা গোবর, ৫ কেজি পাতা পচা সার ও ৫০০ গ্রাম ছাই ভালোভাবে মিশিয়ে গর্তের উপরের স্তরে দিতে হবে। এভাবে গর্ত সম্পূর্ণ ভরাট করার পর ১৫-২০ দিন ফেলে রাখলে সারগুলো পচবে ও গাছ লাগানোর উপযুক্ত হবে। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সে জন্য নালা তৈরি করতে হবে।



চিত্র : ফুলসহ গোলাপের ভাল

চারা বা কলম রোপণ

আশ্চর্ষিত মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পৌষ মাস পর্যন্ত চারা লাগালে বেডের গর্তের মাঝখানে শুদ্ধাকৃতির গর্ত খুঁড়ে চারা লাগাতে হয়। প্রথমে পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টব থেকে চারা বের করে দুর্বল শাখা, রোগাক্রান্ত শিকড় ইত্যাদি কেটে ফেলতে হয়। চারা লাগিয়ে গোড়ায় শজভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটি পুতে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগিয়ে গোড়ায় পানি দেওয়া উচিত। ২-৩ দিন ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পরিচর্যা

- আগাছা দমন : গোলাপের কেয়ারিতে অনেক আগাছা হয়। আগাছা তুলে ফেলতে হবে।
- পানি সেচ : মাটির আর্দ্রতা যাচাই করে গাছের গোড়ায় এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন মাটিতে রসের ঘাটতি না হয়।
- পানি নিকাশ : গোলাপের কেয়ারিতে কোনো সময়ই পানি জমতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গোলাপ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
- ডাল-পালা ছাঁটাইকরণ (**Prunning**) : গোলাপের নতুন ডালে বেশি ফুল হয়। তাই পুরাতন ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রতিবছর গোলাপ গাছের ডালপালা ছাঁটাই করলে গাছের গঠন কাঠামো সুন্দর ও সুন্দৃ হয় এবং অধিক হারে বড় আকারের ফুল ফোটে।
- ফুলের কুঁড়ি ছাঁটাই : অনেক সময় ছাঁটাই করার পর মূলগাছের ডালে অনেক কুঁড়ি জন্মায়। সবগুলো কুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল তেমন বড় হয় না। তাই বড় ফুল ফোটার জন্য মাঝের কুঁড়ি রেখে পাশের কুঁড়িগুলো ধারালো চাকু দিয়ে কেটে দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফুলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ পরিদর্শন শেষে গোলাপ ফুলের চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে যেসব পোকা দেখা যায় তন্মধ্যে রেড স্কেল ও বিটল প্রধান।

- রেড স্কেল : এ পোকা দেখতে অনেকটা মরা চামড়ার মতো। গরমের সময় বর্ষাকালে এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের বাকলের রস চুয়ে থায়। ফলে বাকলে ছোট ছোট কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার না করলে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। গাছের সংখ্যা কম হলে দাঁত মাজার ত্রাশ দিয়ে আক্রান্ত হ্রাস করলে পোকা পড়ে যায়। কীটনাশক প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।
- বিটল পোকা : শীতকালের শেষে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের কঢ়ি পাতা ও ফুলের পাপড়ি ছিদ্র করে থায়। সাধারণত রাতের বেলা আক্রমণ করে। আলোর ফাঁদ পেতে এ পোকা দমন করা যায়। কীটনাশক ছিটিয়েও এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে অনেক রোগ হয়। তন্মধ্যে কালো দাগ পড়া রোগ, ডাইব্যাক ও পাউডারি মিলডিউ প্রধান।

- ক) কালো দাগ পড়া রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। রোগাক্রম্ভ গাছের পাতায় গোলাকার কালো রঙের দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতা বারে গিয়ে গাছ পতাশুন্য হয়ে যায়। চৈত্র থেকে শুরু করে কর্তিক মাস পর্যন্ত এ রোগের আক্রমণ ঘটে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য গাছে সুবম সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সে দিকে খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।
- খ) ডাইব্যাক : ডাল ছাঁটাইয়ের কাটা স্থানে এ রোগ আক্রমণ করে। এ রোগ হলে গাছের ডাল বা কাণ্ড মাথা থেকে কালো হয়ে নিচের দিকে মরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত কাণ্ড বা ডালের বেশ নিচ থেকে কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের চাকু জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ডাল ছাঁটাই করা উচিত। কর্তিত স্থান স্পিরিট দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- গ) পাউডারি মিলভিউ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। শীতকালে কুয়াশার সময় এ রোগের বিস্তার ঘটে। এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতা, কঠিফুল ও কলিতে সাদা পাউডার দেখা যায়। ফলে কুঁড়ি না ফুটে নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত ডগা বা পাতা তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া থিওভিট বা সালফার, ডাইথেন এম-৪৫ বেকোনো একটি পানিতে মিশিয়ে সঙ্গে একবার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফুল সংগ্রহ

ফুল ফোটার পূর্বেই গাছ হতে ফুল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের পর ফুলের ডাটার নিচের অংশ পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে ফুল ভালো থাকে। মাঝে মাঝে ফুলে পানির ছিটা দেওয়া ভালো।

বেলি ফুল চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুলের তোড়া, ফুলের মালাতে সুগন্ধীফুল হিসাবে বেলির কদর আছে। উৎসব ও অনুষ্ঠানে বেলিফুল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অর্থকরী ফুল।

জাত

তিন জাতের বেলি ফুল দেখা যায়। যথা : ১। সিঙ্গেল ধরনের ও অধিক গন্ধযুক্ত। ২। মাঝারি আকার ও ডবল ধরনের। ৩। বৃহদাকার ডবল ধরনের।

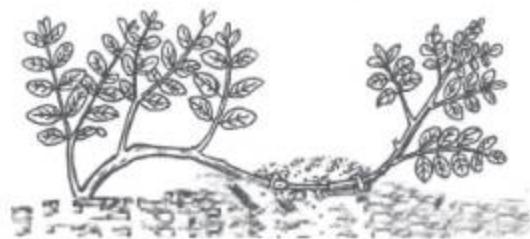


চিত্র : ফুলসহ বেলিফুল গাছ

বংশবিস্তার : বেলি ফুলে ছুটি কলম, দাবা কলম ও ডাল কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়।



চিত্র : টবে দাবা কলম



চিত্র : মাটিতে দাবা কলম

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ

বেলে মাটি ও ভালী এঁটেল মাটি ব্যতীত সব ধরনের মাটিতে বেলি ফুল চাষ করা যায়। জমিতে পানি সেচ ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকা ভালো। জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। জমি তৈরির সময় জৈব সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রায় ১ মিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগানোর পর ইউরিয়া প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হবে।

কলম বা চারা তৈরি

গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলি ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে। চারা লাগানোর জন্য গর্ত খুঁড়ে গর্তের মাটি রোদ লাগিয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম বসাতে হবে। বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায়।

টবে চারা লাগানো

জৈব পদার্থ যুক্ত দোআঁশ মাটিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার পরিমাণমতো মিশিয়ে টবে বেলি ফুলের চাষ করা যায়। টব ঘরের বারান্দা বা ঘরের ছাদে রেখে দেওয়া যায়।

পরিচর্যা

- সেচ দেওয়া : বেলি ফুলের চাষে জমিতে সব সময় রস থাকা দরকার। গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পর পর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর ও বর্ষাকালে বৃষ্টি সময়মতো না হলে জমির অবস্থা বুরো ২-৩টি সেচ দেওয়া দরকার।
- আগাছা দমন : জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না।
- অঙ্গ ছাঁটাইকরণ : প্রতিবছরই বেলি ফুলের গাছের ডাল-পালা ছাঁটাই করা দরকার। শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করতে হবে। মাটির উপরের স্তর থেকে ৩০ সেমি উপরে বেলি ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে। অঙ্গ ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বেলি ফুল গাছে ক্ষতিকারক কীট তেমন দেখা যায় না। তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। এদের আক্রমণে পাতায় সাদা আন্তরণ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুকড়ে থায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে থায়। গন্ধক উঁড়া বা গন্ধক ঘটিত মাকড়নাশক যেমন- সালট্যাক, কেলথেন ইত্যাদি পাতায় ছিটে মাকড় দমন করা যায়।

বেলি ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার হত্তাক রোগ দেখা যায়। ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফলন

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। ফলন প্রতি বছর বাড়ে। লতানো বেলিতে ফলন আরও বেশি হয়। সাধারণত ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে ফেলে নতুন চারা লাগানো হয়।

কাজ : ‘গোলাপ ও বেলি ফুলের চাষ করে বেকারত্ব দূর করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব’ -এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।

ফলের চাষ

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফল জন্মায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা কলা ও আলুরস চাষ সম্পর্কে জানব।

কলা চাষ

কলা বাংলাদেশের সব জেলায়ই কম বেশি জন্মে। তবে নরসিংহী, মুলীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এসব জেলায় কলার ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয়, যা থেকে বছরে ছয় লক্ষাধিক টন কলা পাওয়া যায়। কলা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলায় ক্যালরির পরিমাণও বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কলার চাষ হয়ে থাকে। কলা কাঁচা অবস্থায় তরকারি হিসাবে এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে খাওয়া হয়। রোগীর পথ্য হিসাবে কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

কলার জাত

বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশে যেসব কলার জাত চাষ করা হয়, সেগুলো হচ্ছে অমৃতসাগর, সবরি, চাপা, মেহেরসাগর, কবরী ইত্যাদি। এ ছাড়াও কলার আরও অনেক জাত আছে যেমন : এঁটে কলা, বাঙ্গলা কলা, জাহাজি কলা, কাঁচকলা বা আলজি কলা ইত্যাদি। তবে বারি কলা-১, বারিকলা-২ ও বারিকলা-৩ নামে তিনটি উল্লিখিত জাত চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বারিকলা-২ জাতটি কাঁচকলার।

কলার উৎপাদন প্রযুক্তি : কলার উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে মাটি ও জমি তৈরি, রোপণের সময় ও চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, অন্তর্ভূকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি।

মাটি ও জমি তৈরি

উর্বর দোআশ মাটি কলা চাষের জন্য ভালো। জমিতে প্রচুর সুর্যের আলো পড়বে এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। গভীরভাবে জমি চাষ করে দুই মিটার দূরে দূরে ৫০ সেমি \times ৫০ সেমি \times ৫০ সেমি আকারের গর্ত খুড়তে হবে। চারা রোপণের প্রায় একমাস আগে গর্ত করে গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

বছরে তিন মৌসুমে কলার চাষ করা হয় বা কলার চারা রোপণ করা হয় যথা :

- ১। আশ্বিন-কার্তিক
- ২। মাঘ-ফালুন
- ৩। চৈত্র-বৈশাখ

কলার চারা নির্বাচন

কলার চারাকে তেউড় বলা হয় ।

দুই রকমের তেউড় দেখা যায় । যথা :

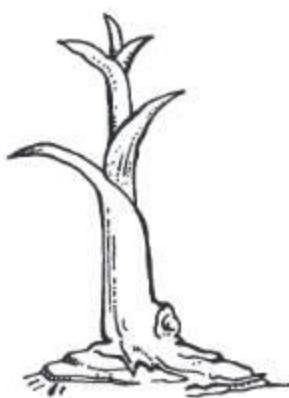
- ১। অসি তেউড় (Sword Sucker)
- ২। পানি তেউড় (Water Sucker)

১। অসি তেউড় : কলা চাষের জন্য অসি তেউড় উভয় । অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো । গোড়ার দিকে মোটা এবং ক্রমশ উপরের দিকে সরু হতে থাকে ।

২। পানি তেউড় : পানি তেউড় দুর্বল । এর আগা-গোড়া সমান থাকে । কলা চাষের জন্য এই চারা উপযুক্ত নয় । এ দুই ধরনের চারা ছাড়াও সম্পূর্ণ মূলগ্রহিত বা তার ক্ষুদ্র অংশ থেকেও কলা গাছের বংশবিত্তার সম্ভব । তবে এতে ফল আসতে কিছু বেশি সময় লাগে । ফলস্ত ও অফলস্ত দুই ধরনের গাছেরই মূলগ্রহিত চারা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।



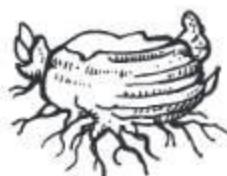
চিত্র : কাদিসহ কলাগাছ



চিত্র : অসি চারা



চিত্র : পানি চারা



চিত্র : মূলগ্রহিত

চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য প্রথমত অসি তেউড় বা তলোয়ার তেউড় নির্বাচন করতে হবে । খাটো জাতের ৩৫-৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয় । অতঃপর নির্দিষ্ট গর্তে যাতে প্রয়োজনীয় গোবর ও টিএসপি সার দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে, সেখানে চারা লাগাতে হবে । লক্ষ রাখতে হবে যেন চারার কাণ্ড মাটির ভিতরে না ঢোকে ।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কলা গাছে ব্যবহৃত সারের নাম ও গাছ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

সারের নাম	গাছ প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগ করার সময়
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম	সারা রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্ত করে গোবর/ আবর্জনা সার ও ৫০% টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ২ মাস পর বাকি ৫০% টিএসপি , ৫০% এমওপি ও ২৫% ইউরিয়া গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর ২ মাস পর বাকি ৫০% এমওপি ও ৫০% ইউরিয়া এবং ফুল আসার সময় বাকি ২৫% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৫০-৪০০ গ্রাম	
এমওপি	২৫০-৩০০ গ্রাম	
গোবর/আবর্জনা সার	১৫-২০ কেজি	

পরিচর্যা

সেচ ও নিকাশ

কলার জমিতে আর্দ্রতা না থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শুক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নালা কেটে দিতে হবে। কারণ কলাগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

অতিরিক্ত চারা কাটা

ফুল বা মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় যে তেউড় জন্মাবে তা কেটে ফেলতে হবে। মোচা আসার পর গাছ প্রতি ১টি তেউড় রাখা ভালো।

খুঁটি দেওয়া

কলাগাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

কলাগাছ ফল ও পাতার বিটল পোকা, রাইজম উইভিল, থ্রিপস এসব পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ডায়াজিন খুঁটি পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

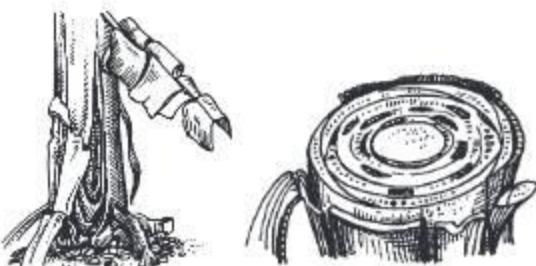
কলা ফল চাষের সময় প্রধানত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যথা-

- ১। পানামা রোগ
- ২। সিগাটোগা
- ৩। গুচ্ছ মাথা রোগ।

১। পানামা রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতা বেঁটির কাছে ভেঙে ঝুলে যায় এবং কাণ্ড অনেক সময় ফেঁটে যায়। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মরে যায় অথবা ফুল-ফল ধরে না। রোগের প্রতিকার হিসাবে রোগমুক্ত গাছ লাগাতে হবে, রোগক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং প্রতিরোধী জাত রোপণ করতে হবে। এ ছাড়া টিল্ট-২৫০ ইসি ছত্রাকলাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

২। সিগাটোগা : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতা বালসে যায় ও সমস্ত পাতা আঙ্গনে পোড়ার মতো দেখায়। ফলে ফল ছেঁট হয় এবং ফলন কম হয়। রোগের প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। গুচ্ছ মাথা রোগ : এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। জাব পোকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। ম্যালাথিয়ন বা অন্য যেকোনো অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগে জাব পোকা দমন করে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।



চিত্র : পানামা রোগক্রান্ত কলাগাছ



চিত্র : সিগাটোগা রোগক্রান্ত কলাপাতা



চিত্র : গুচ্ছ মাথা রোগক্রান্ত কলাগাছ

কাজ : শিক্ষার্থীরা কলার বিভিন্ন রোগের নাম, রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।

ফসল সংগ্রহ

- ১। চারা রোপণের পর ১১-১৫ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।
- ২। ধারালো দা দিয়ে কলার ছড়া কাটতে হবে।

ফলন

 ভালোভাবে কলার চাষ করলে গাছ প্রতি প্রায় ২০ কেজি বা প্রতি হেক্টেরে প্রায় ২০-৪০ টন কলা উৎপাদিত হবে।

আনারস চাষ

বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টের জমিতে আনারস চাষ করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইলের মধ্যপুরে ব্যাপক আনারসের চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংহনী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও প্রচুর আনারস জন্মে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার (জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি একটি অর্থকরী ফসল। আনারস রপ্তানিপণ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের জাত : বাংলাদেশে আনারসের তিনটি জাত দেখা যায়। যথা : হানিকুইন, জায়েন্ট কিউ ও ঘোড়াশাল।

আনারসের উৎপাদন পদ্ধতি : আনারসের উৎপাদন পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মাটি ও জমি তৈরি

দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি আনারস উৎপাদনের জন্য ভালো। জমি চাষ ও মই এমনভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল হয় এবং জমিতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে। চারা রোপণের জন্য চাষকৃত জমিতে ১৫ সেমি উচ্চ এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড় তৈরি করতে হবে। এক বেড় থেকে আর এক বেড়ের দূরত্ব হবে ৫০-১০০ সেমি। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করার জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যা বেশি খাড়া নয়। পাহাড়ের ঢালু জমি কোনোক্রমেই চাষ বা কোনো দিয়ে মাটি আলগা করা যাবে না, শুধু আগাছা ভালোভাবে পরিকার করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে।

চারা নির্বাচন ও তৈরি

আনারস গাছের বংশবিস্তার অঙ্গজ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনারস গাছে সাধারণত চার ধরনের চারা উৎপন্ন হয় যাদেরকে সাকার বা তেড়ড় বলা হয়। সাকার বা তেড়ড়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

- ফলের মাথায় দুই ধরনের চারা উৎপন্ন হয়। ফলের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে। আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের হয় তাকে ক্ষক্ষ চারা বা মুকুট স্ট্রিপ বলে।
- ফলের গোড়া বা বেঁটার উপর থেকে যে চারা বের হয় তাকে বেঁটা চারা বলে।
- বেঁটার নিচে কিন্তু মাটির উপরে কাণ্ড থেকে যে চারা বের হয় তাকে পার্শ্বচারা বা কাণ্ডের কেকড়ি বলে।
- গাছের গোড়া থেকে মাটি ভেদ করে যে চারা বের হয় তাকে গোড়ার কেকড়ি বা ভুঁয়ে চারা বলে। আনারস চাষের জন্য ভুঁয়ে চারা ও পার্শ্বচারা সবচেয়ে ভালো।



চিত্র : আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা

চারা রোপণ

মধ্য আর্শিন হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এই এক মাস আনারসের চারা রোপণের সঠিক সময়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা রোপণের সময় আরও এক/দেড় মাস পিছানো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ১। সার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রথম কাজ হলো পরিমাণ নির্ধারণ। আনারসের জন্য গাছ প্রতি নিম্নোক্ত হাবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টিএসপি	১০-১৫
এমওপি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

২। (ক) গোবর, টিএসপি ও জিপসাম বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া ও এমওপি (পটাশ) চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে ৫ কিণ্টিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুক্র মৌসুমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য নালা কেটে দিতে হবে। চারা অতি লম্বা হলে ৩০ সেমি রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আনারস ফসলে তেমন কোনো ফুটিকর পোকামাকড় ও রোগ সহজে আক্রমণ করে না। তাই বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো না।

ফল সংগ্রহ

চারার বয়স ১৫/১৬ মাস হলে মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়ে আনারসের ফুল আসা শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে। গাছ থেকে আনারসের বোঁটা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টেরে হানিকুইন ২০-২৫ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ পরিদর্শন শেষে আনারস চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
-------	--

চতুর্থ পরিচেছন মাছ চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাগুর, পাবদা ও টেংরা মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এরা আইশিবিহীন ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ যাদের শরীরে আইশ নেই এবং মুখে বিড়ালের ন্যায় লম্বা গৌফ বা ঝঁড় আছে তাদেরকে ক্যাটফিশ বলে। প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ বিপর্যয় ও অত্যাধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি প্রায় একই রূক্ষ। আবার টেংরা ও পাবদার চাষ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের টেংরা মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গুলশা টেংরার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উভাবিত হয়েছে। নিচে শিং, মাগুর, পাবদা ও গুলশা টেংরার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) শিং ও মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাগুর মাছের পরিচিতি

শিং ও মাগুর মাছের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। এদের দেহ লম্বাটে, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চ্যাপ্টা ও আইশিবিহীন এবং মাথার উপর নিচ চ্যাপ্টা। মুখে চার জোড়া ঝঁড় ও মাথার দুই পাশে দুইটি কাঁটা আছে। কিন্তু শিং মাছ মাগুর মাছের চেয়ে আকারে ছোট হয় এবং মাথা তুলনামূলক সরু হয়। শিং মাছের পাশ্বীয় কাঁটা দুইটি বিষাক্ত হয়। এজন্য শিং মাছের কাঁটা খেলে আক্রমণ স্থানে যথেষ্ট ব্যথা অন্তর্ভুক্ত হয়। শিং মাছের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। অন্যদিকে মাগুরের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি খয়েরি ও বড় হলে ধূসর বাদামি হয়। শিং ও মাগুর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলকা ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে, যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে। ফলে এরা অন্ত অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা পানি ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এজন্য শিং ও মাগুর মাছকে জিওল মাছ বলা হয়। শিং ও মাগুর মাছ সর্বভুক্ত জাতীয় মাছ। এরা জলাশয়ের তলদেশে থাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন স্কুদ্র স্কুদ্র প্রাণী ও পচা জৈব আবর্জনা থায়। এরা বছরে ১ বার প্রজনন করে থাকে। এদের প্রজনন কাল হচ্ছে মে থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুন-জুলাই মাসে এদের সর্বোচ্চ প্রজনন হয়ে থাকে।



চিত্র: শিং মাছ



চিত্র: মাগুর মাছ

শিৎ ও মাত্রের চাষের সুবিধা

বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এ মাছ চাষে অধিক মূলাফা লাভ করা যায়। চাষ পদ্ধতি সহজ। যে কোনো ধরনের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও খাঁচাতেও চাষ করা যায়। থতিকূল পরিবেশে যেমন-অক্সিজেন স্বল্পতা, পানির অত্যাধিক তাপমাত্রা, এমনকি পচা পানিতেও এরা বেঁচে থাকে। অল্প পানিতে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। রোগবালাই খুব কম হয় ও অধিক সহনশীল। অল্প পানিতে এমনকি পানি ছাড়াও এরা দীর্ঘকণ্ঠ বেঁচে থাকে বলে জীবস্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে অল্প সময়েই (৬-৮ মাস) বাজারজাত করার উপযোগী হয়। একক মাছ চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্প মাছ, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের সাথে পুকুরে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিৎ ও মাত্রের মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব

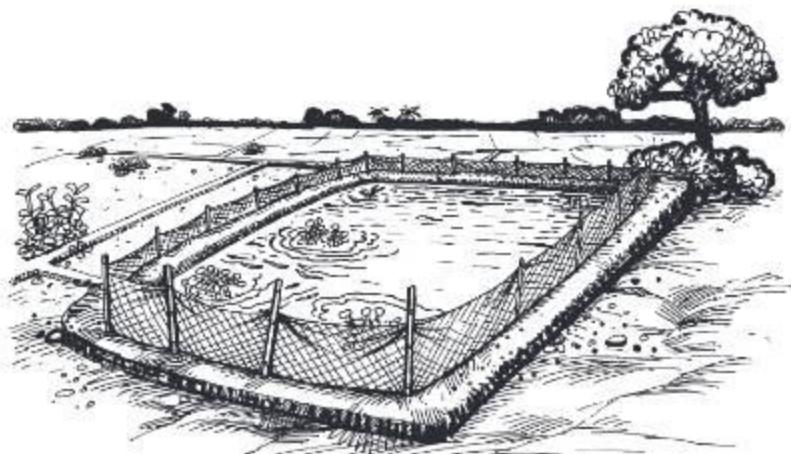
বড় অনেক প্রজাতির তুলনায় শিৎ ও মাত্রের মাছের পুষ্টিগত অনেক বেশি। এসব মাছে শরীরের উপযোগী লৌহ অধিক পরিমাণে আছে। এসব মাছে থোটিনের পরিমাণ বেশি ও তেল কম থাকে। এজন্য সহজে হজম হয়। অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য পথ্য হিসাবে এসব মাছ সমাদৃত। শিৎ ও মাত্রের মাছ রক্ত স্বল্পতা রোধে ও বল বর্ধনে সহায়তা করে।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

শিৎ ও মাত্রের মাছ চাষের জন্য পুকুর ১-১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। পুকুরের আয়তন ১০ শতক থেকে ৩০ শতক হলে ভালো হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরটির পাড় ভাঙ্গ থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুকুরে কচুরিপানা-সহ অন্যান্য জলজ আগাছা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। পুকুরে রাশ্বুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে, বার বার জাল টেনে বা পুকুরের পানিতে রোটেন প্রয়োগ করে তা করা যায়। শীতকালে যখন পুকুরের পানি অনেক কমে যায় তখন পুকুর শুকিয়ে ফেলে পুকুর প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করলে ভালো হয়। পুকুর শুকানো হলে তলায় চুন, গোবর বা কম্পোষ্ট, ইউরিয়া, ট্রিএসপি সার প্রতি শতকে নির্ধারিত হারে যথাযথ নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে যদি পানি থাকে তাহলে পানিতেই চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

নেটের বেষ্টনী/বেড়া নির্মাণ

শিৎ ও মাত্রের মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতির সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, পুকুরের চারদিকে পাড়ের উপর অন্তত ৩০ সেমি উচ্চ করে নেটের বেষ্টনী বা বেড়া নির্মাণ করা। বেষ্টনী দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এতে করে বৃষ্টির সময় মাছ পুকুরের বাইরে চলে যেতে পারে না। বিশেষত মাত্রের মাছকে সামান্য বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়ই 'হেঁটে' (গড়িয়ে) পুকুর থেকে বাইরে যেতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেষ্টনী দেওয়ার ফলে মাছের শাত্ৰু যেমন-সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। নাইলনের নেট খুঁটির সাথে বেঁধে পাড়ের চারদিকে ঘিরে দিতে হবে। নেটের নিচের দিক মাটির ভিতর কিছুটা ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে যেন মাটি ও নেটের মাঝে ফাঁক না থাকে। পুকুর শুকানো হলে শুকানোর পর পরই এ কাজ করতে হবে। কারণ শুকনো অবস্থায় পুকুরে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন-ব্যাঙ, সাপ না থাকে। পানি থাকা অবস্থায় পুকুরে এসব প্রাণী থাকে বিধায় তখন বেষ্টনী দিলে এরাও পুকুরে আটকা পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভিতরে সেগুগোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- কোচ দিয়ে বা বিষ টোপ দিয়ে।



চিত্র: মাঘর মাছের পুকুরে লেটের বেঠনী

পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০টি মাঘর মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। শিং মাছ যেহেতু আকারে ছোট তাই এ মাছ কিন্তু বেশি যেমন- ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত মজুদ করা যেতে পারে। শতকে ৩-৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে যা পুকুরে উৎপাদিত অতিরিক্ত ফাইটোপ্লাঁকটন থেরে পরিবেশ তালো রাখবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকলে শতকে মাঘরের পোনা ২৫০-৩০০টি এবং শিং মাছের পোনা ৪০০-৫০০টি মজুদ করা যাবে। কার্প বা বুই জাতীয় মাছের সাথে শিং/মাঘর এর মিশ্রচাষ করতে চাইলে শতকে শিং/মাঘর এর পোনা ৫০টি এবং বুই জাতীয় মাছের পোনা ৪০টি মজুদ করা যায়। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় হচ্ছে সকাল বা বিকাল (ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়)। দুপুরে রোদে বা মেঘলা দিনে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে পোনা শোধন ও পুকুরের পানিতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ সম্পর্কে কৃষি উপকরণ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত জেনেছি।

মজুদ পরিবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাঘর ও শিং মাছ চাষে মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিচে মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এগুলোর মিশ্রণের হার দেওয়া হলো -

শিং ও মাঘরের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার

খাদ্য উপাদান	নমুনা মিশ্রণ হার (%)
ফিশমিল	২০
মুরগির নাড়ি ভুঁড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট ও বোন মিল)	
সরিষার খেল	২০
চালের কুড়া	৩০
গমের ভুসি	১২
আটা/ চিটাগুড়	৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ গ্রাম/কেজি
সয়াবিন চূর্ণ	৮
ভুট্টা চূর্ণ	৫

শিং/মাণ্ডুর মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা নিচে দেওয়া হলো-

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈহিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৭
> ১০০	৩-৫

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগ করে দিনে ২ বার (সকাল ও বিকালে) দিতে হবে। খাবার অঞ্চল পানিতে মিশিয়ে ছেট ছেট বল করে পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির নিচে স্থাপিত ট্রেতে দেওয়া যাবে। খাদ্য প্রস্তুতের ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই সরিবার খৈল পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা বাণিজ্যিক খাবারও মাছকে প্রদান করা যায়। এতে তৈরিকৃত খাদ্যের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি পড়তে পারে।

২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

চাষকালীন মাছ নিয়মিত বাড়ছে কি না এবং মাছ রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি না জাল টেনে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে। শিং ও মাণ্ডুর মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে মাঝে মাঝে শীতকালে ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ এবং পেট ফোলা রোগ দেখা যায়। নিচে এদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেওয়া হলো:

ক্ষত রোগ : মূলত এ্যাফানোমাইসিস ইনভাইসেস নামক একধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এতে মাংশগোশ্চিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুকুরে ১-১.৫ মিটার পানির গভীরতায় শতকে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরুতে একই হারে পুকুরে চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে শীতকালে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

লেজ বা পাখনা পচা রোগ : এ্যারোমোনাইডস ও মিক্রোব্যাকটের জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গনেট মিশ্রিত করে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিলিট গোসল করাতে হবে। পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি শতক পুকুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেট ফোলা রোগ : এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগ হলে মাছের পেট ফুলে যায়। মাছ ভারসাম্যহীন ভাবে চলাচল করে ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের পেট হতে খালি সিরিঙ্গ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মি গ্রাম ক্লোরামফেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে। আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

মাছ আহরণ

সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ৭-১০ মাসে শিং ও মাণ্ডুর মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। উক্ত সময়ে শিং মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাণ্ডুর মাছ ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুকুরে জাল টেনে বেশির ভাগ মাছ ধরতে হবে। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হলে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

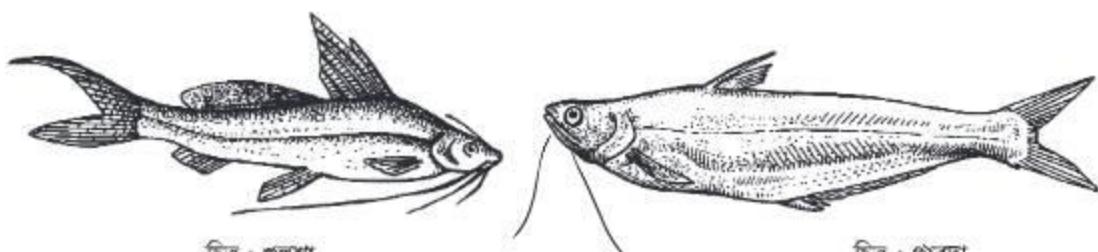
কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে এক একটি পুকুরে শিৎমাওর চাষের সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাতায় লিখে জমা দেবে।

খ) পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি

বিল, হাওর, নদী, পুকুর এবং দিঘিতে পাবদা ও গুলশা মাছ পাওয়া যায়। পাবদা ও গুলশা মাছ খেতে অত্যন্ত সুস্থানু। এ কারণে এদের চাহিদা ও বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। পাবদা মাছ ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ চ্যাপ্টা ও সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিক ক্রমাগত সরু। এ মাছের মুখ বেশ বড় ও বাঁকানো নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড়। মুখের সামনের দিকে দুই জোড়া লম্বা গৌফ আছে। পৃষ্ঠ পাখনা ছোট। পায়ু পাখনা বেশ লম্বা ও লেজ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের রং সাধারণত উপরিভাগে ধূসর রূপালি ও পেঁচের দিক সাদা। ঘাড়ের কাছে কানকোর পিছনে কালো ফোঁটা আছে। শিরদাঁড়া রেখার উপরিভাগে হলুদাত ডোরা দেখতে পাওয়া যায়। পাবদা মাছ মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন সম্পন্ন হয়।

গুলশা মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২০ সেমি হয়ে থাকে। মাছের দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা। পিঁচের অংশ বাঁকানো। মুখ বেশ ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়। মুখে ৪ জোড়া গৌফ বা পুঁড় আছে। পৃষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা কাঁটা যুক্ত। শরীরের রং জলপাই ধূসর, নিচের দিক কিছুটা হাঙ্কা। শিরদাঁড়া রেখা বরাবর নীলাত ডোরা দেখা যায়। এরা বছরে একবার ডিম দেয়। গুলশা মাছের প্রজননকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন করে থাকে।



পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের গুরুত্ব

১. বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং মূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। তাই এদের চাষের মাধ্যমে আর্মীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি সম্ভব।
২. এদের দেহে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রোন বিদ্যমান থাকে।
৩. খেতে খুবই সুস্থানু।
৪. চাষ পদ্ধতি সহজ।
৫. কৃতিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। ফলে সহজে পোনা পাওয়া সম্ভব।
৬. বার্ষিক পুকুর ছাড়াও মৌসুমি পুকুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়েও চাষ করা যায়।
৭. দ্রুত বৰ্ধনশীল, ৫-৬ মাসেই বিপণনযোগ্য হয়।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন

সাধারণত ১৫-২০ শতাংশের পুকুর যেখানে ৭-৮ মাস পানি থাকে এমন পুকুরে এ মাছ দুইবার চাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। থাকলে তা ছেঁটে দিতে হবে যেন পুকুরে পাতা ও ছায়া না পড়ে। পুকুরে রাঙ্কুলে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন থ্রয়োগ করতে হবে। চুন থ্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হারে গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি থ্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সার থ্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৩-৫ গ্রাম ওজনের পোনা শতক প্রতি ২৫০টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়া উচিত। পোনা আনার সাথে সাথে সেগুলো সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে শোধন করে নিতে হবে এবং পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কাজ : দলগতভাবে পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

খাদ্য থ্রয়োগ

পাবদা ও গুলশা মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার :

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	খাদ্য থ্রয়োগ পদ্ধতি
ফিশমিল	৩০	২-৩টি ডুবস্ত ট্রাইতে করে প্রতিদিন দেহ
মিট ও বোন মিল	১০	ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে দৈনিক
সরিষার খেল	১৫	২ বার (সকালে ও বিকালে) থ্রয়োগ
সয়াবিন খেল	২০	করতে হবে।
চালের কুঁড়া	২০	
আটা	৮	
ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রণ	১	

সার থ্রয়োগ

সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার জন্য ৭-১৫ দিন পর শতক প্রতি ৪-৫ কেজি হারে পচা গোবর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গুলিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। ট্রেতে খাবার দেওয়ার আগে পূর্ববর্তী দিনের খাবার সম্পূর্ণ খেয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্য থেকে যাবে তার সমপরিমাণ খাদ্য কম সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে ২ বার জাল টেনে দেহিক বৃক্ষ পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সঙ্গাহে একবার পুরুরে হররা টানতে হবে। পুরুরে পানি কমে গেলে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা (সেক্রিডিস্ক গভীরতা) ২৫ সেমি মধ্যে থাকলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

মাছ আহরণ

গুলশা মাছ ৬ মাসে ৪০-৪৫ গ্রাম এবং পাবদা মাছ ৭-৮ মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এই আকারের পাবদা মাছ বেড়ে জাল দিয়ে ও গুলশা মাছ পুরুর শুকিয়ে আহরণ করা যায়।

নতুন শব্দ : জিওল মাছ, এ্যাফানোমাইসিস ইনভার্ডেল, মাইক্রোনিউট্রেন্ট

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের পৃষ্ঠির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. পৃষ্ঠির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্থানু ও পৃষ্ঠিকর খাবার। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের জোগান দেয় মাছ। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা গড়ে মাত্র ৬০ গ্রাম আমিষ খেয়ে থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই মাছ চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া মাছের তেল দেহের জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ যেমন- মলা, চেলা, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ভিটামিন ‘এ’ রাতকানা রোগ দূর করে। মাছের কাটায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায় যা দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।

২. কাজের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২ % বা ১৯৫ লক্ষের অধিক লোক মৎস্য সেচ্চের থেকে বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি : মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আয় করছে। দেশে রপ্তানি আয়ের ২.৪৬% আসে মৎস্য খাত হতে। মাছ চাষ করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুরুর, ডোবা ও নালা রয়েছে যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে ওয়ামের গরিব ও স্বল্প আয়ের লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

সমন্বিত চাষের ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা হয়। আবার সেই সাথে অনেকের বাড়িতে রয়েছে পুকুর যেটি খোয়ামোছা, রান্নাবাট্টা, গোসল ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। সন্তান পদ্ধতিতে এই সব পুকুরে মাছও লালন করা হয়। এসব হাঁস-মুরগি, মাছ পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখে। পুকুরের উপর ঘর করে যদি হাঁস-মুরগি রাখা যায়, তবে এদের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হয় না। আবার গরুর গোবরও পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে হাঁস-মুরগির উচ্চিষ্ঠ খাদ্য পুকুরে ফেলে দিলে তা মাছের সম্পূরক খাদ্যের জোগান দেয়। অব্যবহৃত পুকুরের পাড়ে ফল-মূল এবং শাকসবজির চাষও করা যায় যেখানে পুকুরের তলার অতিরিক্ত কাদা (পচা জৈব পদার্থ সমূক্ষ) সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ফলমূল ও শাকসবজির ঝরাপাতা কম্পোস্ট সার হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হয়। আবার কৃষকের ধানের জমিতে যে কয়েকমাস পানি থাকে সে সময়ে ধানের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ ফেঁকে মাছের বিষ্ঠা ফেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই মাছ ধানের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফেলে এবং মাছের চলাচল জমিতে আগাছা জন্মাতে বাধা দেয়। এভাবে যখন একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে সমন্বিত চাষ বলে। সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য ফসলের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

সমন্বিত চাষের গুরুত্ব

একই জমিতে একই সময়ে অল্প খরচে একাধিক ফসল পাওয়া যায়। ফলে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হয়। একই ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। সার ব্যবহারের খরচ কমে। শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় (একটি ফসলের জন্য যে শ্রম প্রয়োজন, সেই একই শ্রমে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়)। সম্পন্নের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অপচয় রোধ হয়। ঝুঁকি কম থাকে অর্থাৎ কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হলে অন্য ফসল উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পুরিয়ে নেওয়া যায়।

নিচে আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি (সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ) সম্পর্কে জানব।

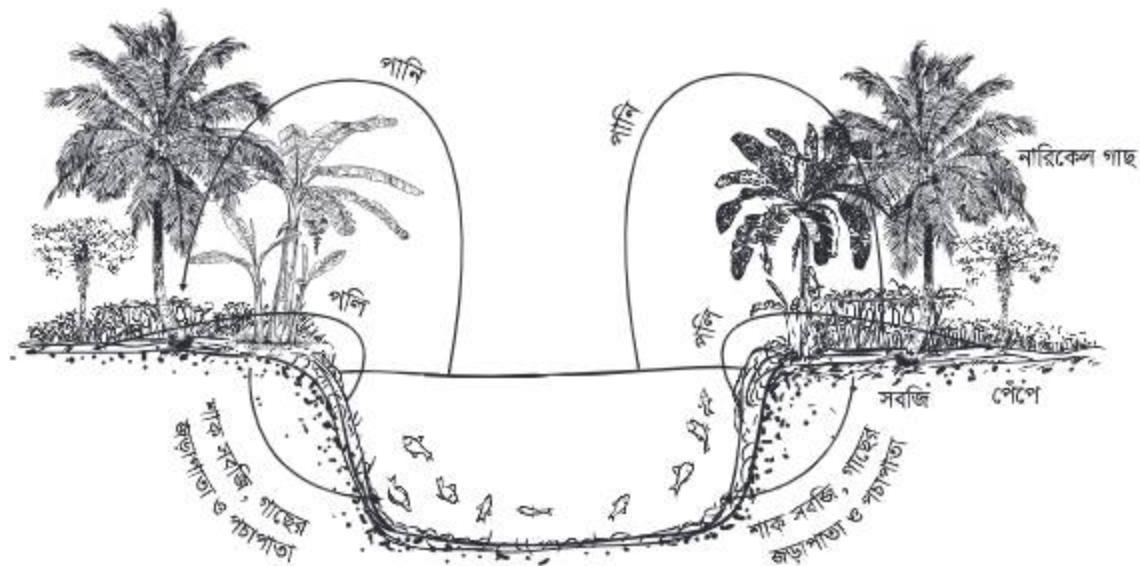
ক) পুকুরের মাছ এবং পাড়ে সবজি ও ফলের সমন্বিত চাষ

মাছ ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষের সুবিধা

শাকসবজি ও ফল গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উৎস। পুকুরবা ঘেরের পাড়ে উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন শাকসবজি চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব। পুকুরের পাড়ে সবজি ও ফল চাষ করতে হলে পুকুর পাড়ের প্রশংসন্তা কমপক্ষে ৮ ফুট রাখতে পারলে ভাল। পুকুরের ঢাল ১:২ অনুপাতে রাখতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। পুকুরে যেকোনো মাছ চাষ করা যায়। যেমন কার্প জাতীয় মাছ যেমন- রাই, কাতলা, মুগেল, কার্প, গ্রাস কার্প, থাই পাঙ্গাস, সরপুটি, তেলাপিয়া। চাষকালীন সময়ে মাছের প্রজাতির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাদ্য মাছকে সরবরাহ করতে হবে।

চাষযোগ্য ফসল নির্বাচন : পুকুরের পাড়ে চাষ উপযোগী ফসল নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। পাড়ে বড় গাছ লাগানো যাবে না কারণ এরা মাটি আলগা করতে পারে এবং পাড়ে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। বড় শাখাযুক্ত গাছও নির্বাচন করা যাবে না কারণ তাদের শাখা-প্রশাখার ছায়া মাছের পুকুরে পর্যাপ্ত রোদ ও আলো পড়তে বাধা দেয়। এমন ফসল নির্বাচন করা উচিত যেগুলো চাষ করার সময় পুকুরের পাড়ের মাটি কম আলগা হয়। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে পুকুর পাড়ে চাষযোগ্য গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসাবে শসা, মিঠি কুমড়া, চিচিঙ্গা ইত্যাদি এবং শীতকালীন সবজি হিসাবে লাউ, শিম, বরবটি ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। আর পুকুরপাড়ে চাষযোগ্য ব্রহ্মমেয়াদি ফল হিসাবে কলা, আনারস, পেঁপে, এবং দীর্ঘমেয়াদি ফল হিসাবে লেবু, পেয়ারা, নারিকেল চাষ করা যায়।

পুকুরে পাড়ের জমি প্রকৃতি : ফল বা সবজি ফসল রোপণ বা বপনের ২-৪ সপ্তাহ আগে ফসল ভেদে বিভিন্ন আকারে পিট বা গর্ত তৈরি করতে হবে এবং সার দিতে হবে। পিটের আকার ৬০-১০০ সেমি ব্যাস এবং ৪৫-৯০ সেমি গভীরতা হতে পারে। সবজির ক্ষেত্রে একটি গর্ত থেকে আরেকটি গর্ত ২-৩ মিটার দূরত্বে রাখতে হবে। একটি গর্তে কয়েকটি বীজ বপন করা যেতে পারে এবং প্রতিটি গর্তে ২-৩টি চারা গজাতে দেওয়া উচিত। লতানো গাছ যেমন- লাউ বা শিম জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে পুকুরের পাড়ে বাঁশ দিয়ে খুঁটি বা মাচা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। মাচার উপর উঠে গাছ ডালপালা বিত্তার করে বড় হয় এবং ফল দেয়। আবার নরম কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ যেমন- পেঁপে গাছের ক্ষেত্রে খুঁটি দিয়ে গাছবেঁধে দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানোর জন্য যেসব গর্ত তৈরি করা হয় সেগুলোতে সাধারণত সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। শুধু পুকুরের তলায় কাদা দিলেই চলে কারণ চাষের পুকুরে তলায় যে কাদা তৈরি হয় তা অত্যন্ত উর্বর থাকে। সারের পরিবর্তে এসব কাদা ব্যবহার যায়। চারা রোপণের পর চারার চারদিকে রিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করলে ভালো গাছে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হলে পুকুরের পানি গাছের গোড়ায় ব্যবহার করা যায়। ফল বা সবজি দেয়া শেষ হলে গাছগুলোর পাতা অথবা চাষকালীন সময়ে মরা ও ঝরা পাতা সবুজ বা কম্পোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সে ক্ষেত্রে মাছের পুকুরে সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।



চিত্র: পুকুরে মাছ এবং পাড়ে সবজি ও ফলের সমন্বিত চাষ

পুরুরের পাড়ে ফসল ফলানোর সুবিধা

১. পুরুরের পাড় সাধারণত পুরুরের তলায় মাটি দ্বারা গঠিত হয় তাই, এটি যেকোনো ধরনের ফসলের জন্য খুব উচ্চ।
২. পুরুরের তলায় অতিরিক্ত কানা পাছের গৌড়ায় সার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। এতে করে জৈব সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
৩. পুরুরের পানি দিয়ে গাছে সেচ দেওয়া যায়।
৪. ফল ও সবজির গাছ ও উৎপাদন পুরুর এলাকায় একটি ভালো পরিবেশগত অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. উৎপাদিত ফসলের মূল পাড়ের মাটি আটকে রাখতে ও কফ রোধে সাহায্য করে।
৬. উৎপাদনজাত ফসল, বিশেষ করে ফলদ ফসল পুরুরের মালিককে মাছের পাশাপাশি ভালো লাভ দেয় এবং প্রতিদিনের গৃহের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

উৎপাদন : পুরুরের নিয়ম মেনে মাছ ও পাড়ে ফল ও সবজি চাষ অন্যায়ে বছরে প্রতি শতাংশে ২০ থেকে ৩০ কেজি মাছ ও প্রচুর সবজি ও ফল উৎপন্ন করা সম্ভব যা দিয়ে পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি আয় করা যেতে পারে।

খ) ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ

ধান চাষের সময় অনেক জমিতেই দীর্ঘদিন পানি ধরে রাখার দরকার হয়। এসব ধানক্ষেতে একটু পরিকল্পনা-মাফিক তৈরি করে নিলে একই জমিতে এক বছরে ধান এবং মাছ ও গলদা চিংড়িসহ একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব। বিশেষভের মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি ধানক্ষেতে মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী বা এখনই ব্যবহার করা যায়। আরও ৩.০ লক্ষ হেক্টর ধানের জমি ভবিষ্যতে গলদা ও মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধা : একই জমিতে অতিরিক্ত ফসল হিসাবে মাছ ও গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয়। এতে জমির সর্বোন্ম ব্যবহার হয়। মাছ ধানের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় থেঁয়ে ফেলে। তাই ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের দরকার হয় না। মাছ ও চিংড়ির চলাফেরার কারণে ক্ষেতে আগাছা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি হয়। মাছ ও চিংড়ির বিষ্টা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে ফলে সারের খরচ তুলনামূলক কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এ পদ্ধতিতে ধানের ফলন গড়ে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জমি নির্বাচন : যেসব জমিতে কমপক্ষে ৪-৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব এবং চাষকালীন সময়ে ক্ষেতের সব অংশে কমপক্ষে ১২-১৫ সেমি পানি থাকে সেসব জমিতে ধান এবং মাছ ও গলদার সমন্বিত চাষ সম্ভব। যে সব জমি উচু অর্থাৎ পানি ধরে রাখতে পারে না, আবার যে সমস্ত জমি বেশি নিচু অর্থাৎ সহজে প্লাবিত হয় এদের কোনোটিই মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়।

মাছ ও গলদা চাষের জন্য ধানক্ষেত প্রস্তুতকরণ

জমির আইল তৈরি/ মেরামত : জমির আইল শক্ত, মজবুত করে তৈরি বা মেরামত করতে হবে। সাধারণ বন্যায় যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ৩০-৬০ সেমি উচু করে আইল তৈরি করা ভালো। আইল পর্যাপ্ত চওড়া হতে হবে। এতে আইল তাঢ়াতাঢ়ি ভাঙবে না ও আইলে কিছু শাকসবজি ও চাষ করা যাবে।

ধানক্ষেতে ডোবা ও খাল/নালা খনন : মাছ ও চিংড়ির আশ্রয় ও চলাচলের সুবিধার জন্য ধান ক্ষেতের আইলের চারপাশে ভিতরের দিকে নালা খনন করা হয় অথবা আইলের এক বা দুইপাশে নালা বা ডোবা খনন করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের মাঝখানে বা কোনায় ডোবা খনন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতে নালা ও ডোবা দুই-ই খনন করা হয়। সেক্ষেত্রে ডোবার সাথে নালার সংযোগ থাকে। মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা ডোবা ও নালা হলেই চলে। এদের গভীরতা ০.৫-০.৮ মিটার হলে ভালো হয়। জমির ঢালু বা নিচু অংশে ডোবা তৈরি করা হয়।

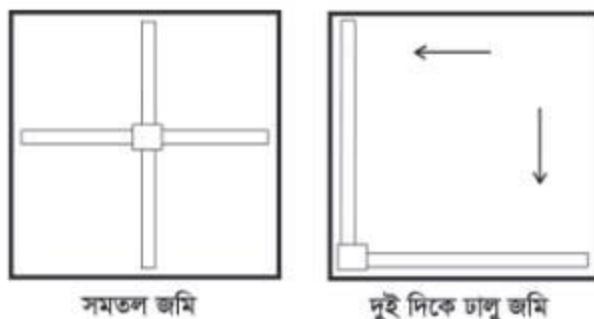
ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির সুবিধা হচ্ছে- (১) ক্ষেতের পানি কমে গেলে বা খুব গরম হয়ে গেলে চিংড়ি ও মাছ গর্ত ও নালার অপেক্ষাকৃত গভীরে ঠাণ্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারে। (২) আগাছা পরিকার বা মাছ ধরার প্রয়োজন হলে জমির পানি শুকিয়ে মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে তা সহজেই করা যায়।

গলদা চিংড়ির আশ্রয়স্থল সৃষ্টি : চিংড়ির জন্য ডোবা বা খালে কৃতিম প্লাস্টিক বা শুকনো কঢ়ি দিয়ে গলদার আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। চিংড়ি এখানে খোলস বদলের সময় নাজুক অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারবে।

ধানের জমি তৈরি : জমিতে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে প্রচলিত নিয়মে সার, গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে।

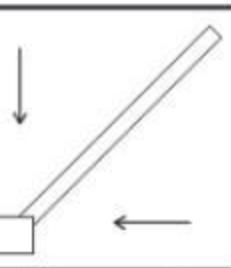
ধানের জাত নির্বাচন : ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য বি আর-৩ (বিপুব), বি আর-১১ (মুক্তা), বি আর-১৪ (গাজী), বি আর-২ (মালা) ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল ধান নির্বাচন করা উচিত।

ধান রোপণ পদ্ধতি : ধানের চারা সারিবন্ধভাবে রোপণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি রাখতে হবে। পর পর ৫-৬ সারি লাগানোর পর ৩৫-৪০ সেমি ফাঁকা রাখতে হবে। এতে মাছ ও চিংড়ির চলাচলে সুবিধা হয় এবং পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়তে পারে ফলে দ্রুত মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে।

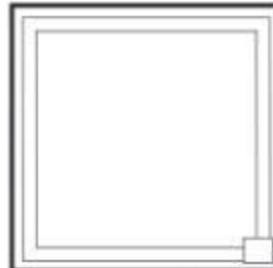


সমতল জমি

দুই দিকে ঢালু জমি



দুই দিকে ঢালু জমি



সমতল জমি

চিত্র: ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির কয়েকটি নকশা

মাছের প্রজাতির নির্বাচন : যেহেতু ধানক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না তাই কম পানিতে ও কম অঙ্গিজনে বাঁচতে পারে, উচ্চ তাপমাত্রা সহ করতে পারে এবং সেই সাথে ধান চাষকালীন সময়ের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয় একপ দ্রুত বর্ধনশীল মাছ নির্বাচন করতে হবে, যেমন- কার্পিও, সরপুটি, তেলাপিয়া। তবে এগুলোর সাথে অল্লসংখ্যক বুই, কাতলা দেওয়া যেতে পারে। আবার মাঘের পোনা ও ছাড়া যায়। তবে গ্রাস কার্প ছাড়া যাবে না কারণ এরা ধান গাছ থেয়ে ফেলতে পারে।

পোনা মজুদ : ধান রোপণের ১০-১৫ দিন পর যখন ধান গাছ শক্তভাবে মাটিতে লেগে যাবে, তখন চিংড়ি ও মাছ মজুদ করতে হবে। শতাংশ প্রতি মাছের পোনা ১৫-২০টি ও চিংড়ির পোনা ৪০-৫০টি মজুদ করা যেতে পারে।

সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ : চালের কুঁড়া, খৈল, ফিশমিল ১:১:১ অনুপাতে নিয়ে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আটা পানিতে ফুটিয়ে আঠালো করে উচ্চ উপকরণগুলোর সাথে মিশিয়ে কাই করে ছেট ছেট বল বানিয়ে মাছ ও চিংড়িকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% খাবার তিন ভাগ করে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা : ধানের সাথে মাছ চাষ করলে কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়। তবে কীটনাশক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে মাছকে ডোবা/নালায় আটকিয়ে তা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের অন্তত ৫ দিন পর সেচ দিয়ে পুনরায় মাছকে সমস্ত জমিতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে। ক্ষেতের পানি কমে গেলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাছে রোগবালায়ের লক্ষণ দেখা দিলে মাছগুলোকে ডোবার মধ্যে নিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ধান, মাছ ও চিংড়ি আহরণ : ধান কাটার সময় হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে চিংড়ি ও মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে ধান কাটতে হবে। ধান কাটার পরও যদি ক্ষেতে পানি থাকে বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী ফসল শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত মাছ চাষ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশুপাখি পালন পদ্ধতি

গৃহপালিত পশুর আবাসন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুর আশ্রয় প্রদানকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলা হয়। পশুকে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়, তাকে বাসস্থান বা গোয়াল ঘর বলে। পশুর বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবহার্পনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। গোয়াল ঘরে সব সময় পশুকে আবক্ষ না রেখে মাঝে মধ্যে বাইরে ঘুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

আবাসনের উদ্দেশ্য

- | | |
|---|--|
| ১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা | ৯। দক্ষতার সাথে দুঃখ দোহন করা |
| ২। পশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেওয়া | ১০। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা |
| ৩। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা | ১১। পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেওয়া |
| ৪। পোকা-মাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা | ১২। সময়মতো চিকিৎসা সেবা দেওয়া |
| ৫। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা | ১৩। সহজে গোয়াল ঘর পরিকার করা |
| ৬। পশুকে শাস্ত করা | ১৪। রোগ প্রতিরোধ ও নিরত্বণ করা |
| ৭। গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চার সঠিক পরিচর্যা করা | ১৫। গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা |
| ৮। পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা | ১৬। উৎপাদন খরচ কমানো ইত্যাদি। |

পশুর আবাসনের স্থান নির্বাচন করা

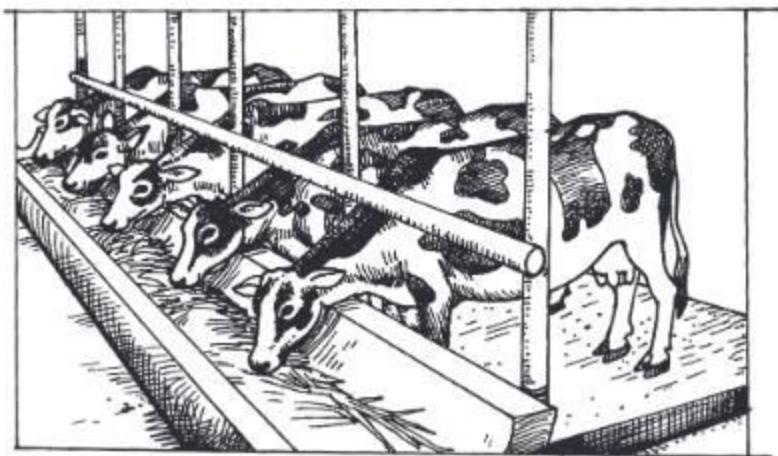
পশুর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে খামার লাভজনক করা যায় না। পশুর আবাসন মূলধন ও পশুর সংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলোর জন্য গৃহপালিত পশুর আবাসন বা বাসস্থান তৈরি করতে হবে—

- ১। উঁচু, শুকনো ও বন্যামুক এলাকা
- ২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে একটু দূরে
- ৩। দুধ ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা
- ৪। ভালো যাতায়াতব্যবস্থা
- ৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা
- ৬। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন

- ৭। গোয়াল ঘরে যেন সূর্যালোক পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা
- ৮। গোয়াল ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখা
- ৯। পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখা
- ১০। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকা ইত্যাদি।

গরুর আবাসন

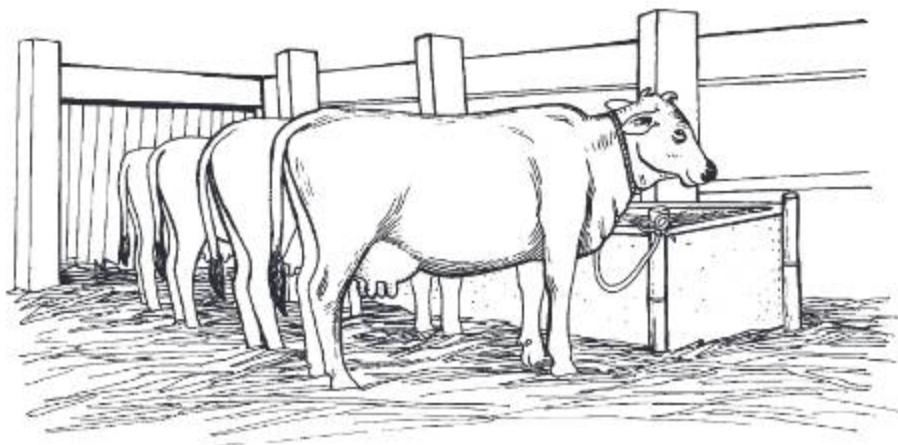
গরুর আবাসনের জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো গোশালা বা গোয়াল ঘরে বেঁধে পশু পালন করা। গোয়াল ঘরের আকার পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। গরুর সংখ্যা ১০-এর কম হলে ১ সারি বিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।



চিত্র: গরুর আবাসন

গাড়ী পালন

কৃষির অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে গবাদি পশু ও গাড়ী পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বলা হয়ে থাকে একটি জাতির মেধার বিকাশ নির্ভর করে মূলত ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর। আজকের বিশ্বে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে, গাড়ীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাড়ী পালন একটি শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে পাঁচ ধরনের উন্নত জাতের গাড়ী দেখা যায়, সেগুলো হলো, হলস্টেইন, ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিকি, রেড চিটাগাং প্রভৃতি। এই সমস্ত জাতের গাড়ীর দুধ উৎপাদনক্ষমতা মোটামুটি ভালো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন ও প্রজনন করালে এদের উৎপাদনক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র : খামারের দুঃখবতী গাভী

গাভীর পরিচয়

গাভীর পরিচয়ের লক্ষ্য হলো গাভী যাতে অধিক কর্মক্ষম থাকে। গাভীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও দুঃখদোহন কালের পরিচর্বার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব পরিচর্বায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়ে। গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এই সময়ে গাভীর ভিতরের বাচ্চা বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসবের কয়েক দিন আগে গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই গাভীকে সমতল জায়গায় রাখতে হবে। গর্ভধারণ ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্বা করতে হবে। গর্ভকালীন অবহেলা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাচ্চুরকে অবশ্যই শাঙ্গ দুধ খাওয়াতে হবে। কারণ এই শাঙ্গ দুধ রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাচ্চা প্রসবের পর ফুল পড়ে গেলে তা সাথে সাথে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয়, এর পরে স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায়। দুধ দোহনের সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরুত থাকতে হবে এবং দুততার সাথে দোহনের কাজ শেষ করতে হবে। গাভীর বাচ্চা প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হলে ডাঙ্গারি পরীক্ষা করে গরম করতে হবে। গাভী পরিচর্বার আরও একটি লক্ষ্য হচ্ছে, গাভীকে পোকামাকড় ও মশা-মাছি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

গাভীর খাদ্য

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ ও ক্রয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, মেহ পদার্থ সংরক্ষণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননের সক্ষমতা অর্জন, গর্ভবস্থায় বাচ্চার বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত

খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতুলতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ গাভীর শারীরিক বিকাশের জন্য সব ধরনের খাদ্য উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব খাদ্য মিশ্রণে পশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান খাকতে হবে। গাভীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাই সুব্যবস্থার খাদ্যের প্রয়োজন। গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিউ অ্যাডিটিভস। আঁশযুক্ত খাদ্যের মধ্যে খড়বিচালি, কাঁচা ঘাস, লতাপাতা, হে, সাইলেজ ইত্যাদি প্রধান। দানাদার খাদ্যের মধ্যে শস্যদানা, গমের ভুসি, চালের কঁড়া, খেল ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া খনিজ ও ভিটামিনের মধ্যে হাড়ের গুঁড়া, বিভিন্ন ভিটামিন - খনিজ প্রিমিয়া পদার্থ রয়েছে। এসব পশু খাদ্য প্রয়োজনমতো সংগ্রহ করে গাভীকে পরিবেশন করতে হবে। গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা একধরনের থাম্বুল পদ্ধতির মাধ্যমে নিক্ষেপণ করা যায়। যেমন-

- ১। প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খড় ও সবুজ ঘাস খেতে পারে তা তাকে খেতে দিতে হবে।
- ২। গাভীর শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১.৫ কেজি দানাদার এবং প্রতি ১.০ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও সবুজ ঘাসের সাথে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- ৩। গাভীকে ৪০-৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া ও ১০০ -১২০ গ্রাম খাদ্য লবণ সরবরাহ করতে হবে।
- ৪। তাছাড়া দুঃখবতী গাভীকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবাণুমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কর্তৃতোলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায়, যা এ যাবৎ কাল পঞ্জসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো -

- বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিরামণ করা
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা
- পচা, বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা
- সর্বদা তাজা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা
- প্রজনন ও প্রসবে নিজীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করা
- দুুত মলমৃত্তি নিষ্কাশন করা
- অসুস্থ গাভীর পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সংকার করা
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা
- সংক্রমক ব্যাধির প্রতিমেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

গাভীকে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

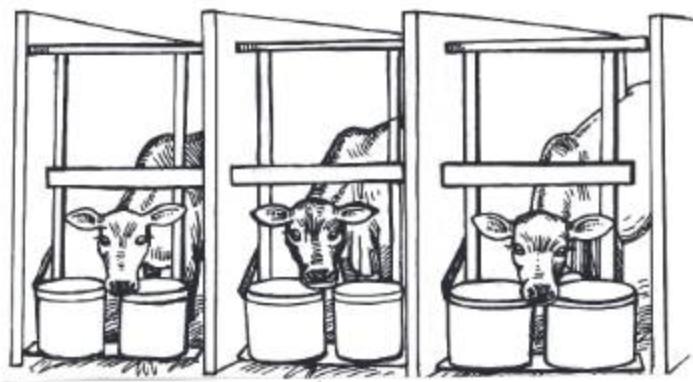
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে অসুস্থ গাভী শনাক্ত করা যায়। গাভীর বিভিন্ন রোগবালাই যেন না হয়, সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। গাভী তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা রোগ, গলাফোলা, রিন্ডারপেস্ট, ম্যাস্টাইটিস, পরজীবী ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গাভীর যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাছুর পালন

গরু মহিষের শৈশবকালকে বাছুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু মহিষের বাচাই বাছুর নামে পরিচিত। দুঃখ খামারের ভবিষ্যৎ বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের দুধ উৎপাদনশীল গাভী, উন্নত মানের প্রজনন উপযোগী ঘাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী গরু। তাই পশুপালন বিজ্ঞানে বাছুর পালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অঙ্গ বয়সের এই গরু বা মহিষের বাচা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। আমাদের দেশে যে সংখ্যক গবাদি পশু পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগেরও বেশি বাছুর। তাই সুস্থ-সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন গর্ভবস্থায় গাভীর সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও নবজাত বাছুরের সঠিক যত্ন।

বাছুরের বাসস্থান

দেশীয় জাতের একটি বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন সাধারণত ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন ধ্রায় ২৫-৩০ কেজি হয়। একটি বাছুরের বাসস্থানের জায়গা কতটুকু হয় বাছুরের আকারের উপর তা মূলত নির্ভর করে। প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৩৫ বর্গফুট (৩.২৫ ব.মি.) জায়গার ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়।



চিত্র : ঘরের ছোট খোপে বাছুর

বাছুরের বাসস্থানের জায়গা এমন হতে হবে যেন ঘরে প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাস প্রবেশ করে। বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা হতে পারে, তবে এতে মলমুক্ত নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি ছোট বাছুরের জন্য ১২ বর্গফুট (১.১১ ব.মি.) জায়গার প্রয়োজন। বাছুরের খোপে খড় বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। যেবে পাকা হলে তা বেন কর্দমাক্ত ও সেঁতস্যাতে না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাচ্চুরের পরিচর্যা

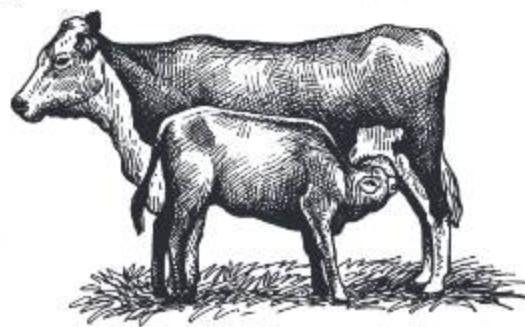
বাচ্চুরের পরিচর্যা বলতে এদের খাদ্য পরিবেশন, রোগবালাই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বোঝায়। আমাদের দেশে বাচ্চুরের আলাদা যত্ন নেওয়ার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্চুর জন্মের পর থেকে দৈহিক পরিপন্থতা অর্জন না করা পর্যন্ত এদের পালন করা বা এদের দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাচ্চুর জন্মের পরবর্তী করণীয়

বাচ্চুর জন্মের পর পরই বস্তার উপর রেখে নাক-মুখ পরিষ্কার করার পর শরীর পরিষ্কার করার জন্য গাভীর সামনে দিতে হবে। বাচ্চুরের নাভী রজ্জু বারে না গেলে নাভী থেকে ৫ সেমি দূরে ব্রেড দিয়ে কেটে স্যাভলন বা টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে।

বাচ্চুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো

জন্মের পর পরই বাচ্চুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময়ে অনেক বাচ্চুর মাঘের বাট থেকে দুধ চুরে খেতে পারে না। তাই বাচ্চুরের মুখের ভিতর বাট দিয়ে দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাতে হয়। গাভীর উৎপাদনক্ষমতা কম হলে অনেক সময় অন্য গাভীর দুধ পান করানোর প্রয়োজন হতে পারে। শৈশবে বাচ্চুরকে ৩৭.৫ সে. তাপমাত্রার দুধ পান করানো হয়। সাধারণত বোতলে বা বালতিতে করে বাচ্চুরকে দুধ খাওয়ানো হয়। বিশুদ্ধ দুধ ও পানি ১ : ২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উচ্চম। দুধ খাওয়ানোর পর বোতল অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্র : বাচ্চুর মাঘের দুধ পান করছে



চিত্র : বাচ্চুরকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে

খামার পর্যায়ে বাচ্চুর চিহ্নিতকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো

এটি হোট খামারের জন্য তেমন প্রয়োজন না হলেও বড় খামারের জন্য জরুরি। পশুর জাত উন্নয়ন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত কানে ট্যাগ নম্বর লাগিয়ে পশু চিহ্নিতকরণ করা হয়।

পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, মলমৃত্ব ও বিহানা পরিষ্কার রাখা

বাচ্চুরের সঠিকভাবে বৃদ্ধির জন্য পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত দৈহিক ও জন অনুসারে খাবার প্রদান করা হয়। বর্ধিত বাচ্চুরের চাহিদা অনুসারে জন্ম থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্ভবতভাবে প্রতিপালনের জন্য বাচ্চুরের থাকার ঘরটিতে মলমৃত্ব নিকাশনের ঘরায়থ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়মিত বাচ্চুরের থাকার ঘরের বিহানা পরিষ্কার রাখতে হবে। বাচ্চুরের শোয়ার ঘর যথেষ্ট শুকলো রাখতে হবে।

বাছুর সময়মতো ঘরে তোলা ও বের করা

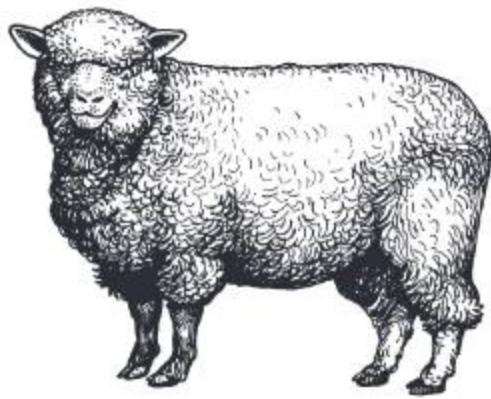
বাছুরকে সময়মতো ঘরে তুলতে হয় এবং ঘর থেকে বের করতে হয়। বাছুরকে সারাদিন ঘেমন ঘরে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয় এবং তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় রাখাও ঠিক নয়। বৃষ্টিতে ভেজা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় থাকলে বাছুরের ফুসফুস প্রদাহ রোগ হতে পারে।

বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাধিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয়। এই সময়ে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি ভালোভাবে না হলে পরবর্তীতে ভালো উৎপাদনশীল গরু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বাছুরের বিভিন্ন রোগবালাই যেন না হয়, সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। বাছুরের ক্ষয়ার, নিউমেনিয়া, ছত্রাক, বাদলা রোগ, কৃমি ও আঁচিল রোগ দেখা যায়। বাছুরের যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশ্চ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভেড়া পালন

ভেড়া একটি নিরীহ প্রাণী। এরা চারণ ঘাস খেতে খুব পছন্দ করে এবং দলগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রজননক্ষমতা বেশি, ১৫ মাসে ২ বার বাচ্চা দেয়। তাই ভেড়া পালন শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে খামারের আকার বড় হয়ে ওঠে এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায়। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কিছু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ভেড়া পশম (Wool) ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। এদেশে ভেড়ার তেমন কোনো ভালো জাত নেই। বাংলাদেশের ভেড়া মোটা পশম উৎপাদন করে। তাই এরা পশমের জন্য জনপ্রিয় নয়। এখানে ভেড়া মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার পশম খুব মূল্যবান ও জনপ্রিয়। ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল, শাল, সোয়েটার, জ্যাকেট তৈরি করা হয়। মোটা পশম কাপেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার এত গুণাঙ্গণ থাকলেও চারণভূমি ও উদ্যোগের অভাবে এদেশে এর পালন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।



চিত্র : সূক্ষ্ম পশমের মেরিনো ভেড়া



চিত্র : মোটা পশমের কারাকুল ভেড়া

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এরা খাবারের জন্য সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবুও নিম্ন লিখিত কারণে এদের বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

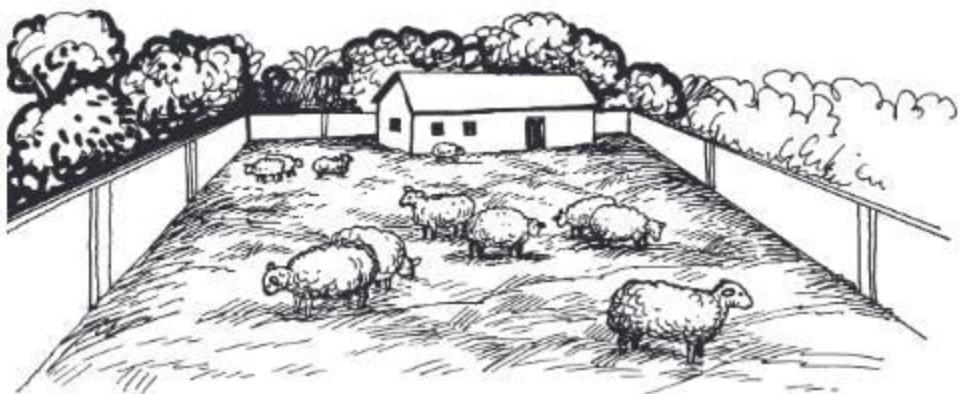
- রাতের বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য
- বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য
- বড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য
- বেশি উৎপাদনক্ষম ভেড়ার দুর্ঘট দোহন করার জন্য
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার পরিচর্যার জন্য
- ভেড়ার পশম কাটার জন্য
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য

ভেড়া পালনের জন্য তিনি ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যথা :

ক. উন্নুক খ. আধা উন্নুক ও গ. আবক্ষ ঘর। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করে রাতে আশ্রয়ের জন্য ভেড়ার ঘর তৈরি করা হয়। ভেড়ার ঘরের মেঝে ভূমি সমতলে বা মাচার তৈরি হয়ে থাকে।

ক. উন্নুক ঘর : যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে উন্নুক ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন চরে খাওয়ার পর রাতে ভেড়ার পাল এখানে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঝেতে খড় ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা উন্নুক ঘর : উন্নুক ঘরের নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ছাদসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আধা উন্নুক ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে বৃষ্টি হয়, সেখানে আধা উন্নুক ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : ভেড়ার আধা উন্নুক ঘর

গ. আবক্ষ ঘর : যেসব অঞ্চলে প্রচুর বাড়বৃষ্টি হয়, সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবক্ষ ঘরের পুরো অংশেই ছাদ থাকে। ঘরের পাশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে। আবক্ষ ঘরের মেঝে পাকা ও আধা পাকা হয়ে থাকে।

বয়স্ক ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাপ -

মাটার মেঝে (বর্গমিটার)	ভূমিসমতলে খড়ের মেঝে (বর্গমিটার)
০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য এবং এদের থেকে বেশি উৎপাদন পেতে হলে সাঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ত্রাশ দিয়ে ভেড়ার পশ্চম পরিকার করতে হবে। এতে পশ্চমের ময়লা বেরিয়ে আসবে। ভেড়ার দেহে মাঝে বিহিংপরজীবীনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ভেড়ার পশ্চম কাটার পূর্বে গোসল করাতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য

ভেড়া যে কোনো ধরনের খাদ্য থেঁয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এটি গরু, মহিষ ও ছাগলের মতোই জাবরকাটা থাণী। ভেড়ার খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস গরু ছাগলের মতোই। এদের রেশনে আঁশযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ দানাদার খাদ্যের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। গর্ভবতী ভেড়ির তুলনায় প্রসূতির খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে ভেড়ির খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করতে হয়। একটি বয়স্ক ভেড়ার দৈনিক ২.০-২.৫ কেজি সবুজ ঘাস এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার খাদ্য তালিকা-

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪০
চিটা গুড়	৫
গমের ভুসি	১০
খেল	৯
শুকানো লিগিউম ঘাস	৩৬
মোট	১০০

কাজ

পাঁচটি মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার প্রতিদিন কী পরিমাণ আঁশ ও দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা হিসাব করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

গর্ভবতী ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪৫
খেল	১০
চিটা গুড়	৫
ভুট্টার সাইলেজ	২০
শুকানো লিগিউম ঘাস	২০

প্রসূতি ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভালোমানের শুকানো লিগিউম ঘাস	৮০
ভুট্টার গুঁড়া	১৩
খেল	৪
গমের ভুসি	৩

নবজাতকের যত্ন

নবজাত মেষ শাবককে জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠে।

ভেড়ার রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

ভেড়াকে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ও সময়সত্ত্বে টিকা প্রদান করতে হবে। ভেড়া বাদলা, তড়কা, ম্যাস্টাইটিস, খুরা রোগ, চর্মরোগ, কৃমি, বহিঃপরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগক্রান্ত ভেড়াকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

হাঁস পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু হাঁস পালনের উপযোগী। এখানে অনেক খালবিল, ডোবানালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ও নদী রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোরসহ অনেক জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে। গ্রামের হাঁসের খামারিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে হাঁস পালন করে থাকে। কিন্তু হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১। উন্নত পদ্ধতি

৩। অর্ধ-আবন্ধ পদ্ধতি

২। আবন্ধ পদ্ধতি

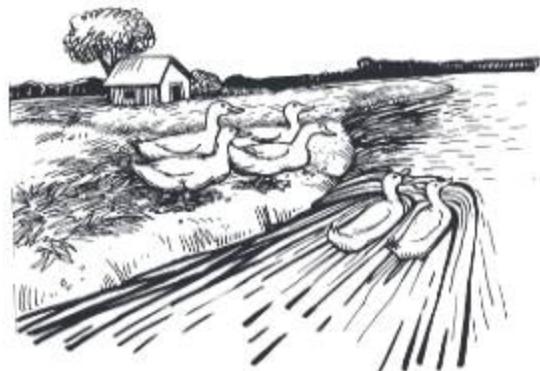
৪। ভাসমান পদ্ধতি

১। উন্নত পদ্ধতি

হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উন্নত পদ্ধতি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সকালবেলায় হাঁসগুলোকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবন্ধ থাকে। এখানে হাঁসকে সাধারণত কোনো খাবার দেওয়া হয় না। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন, ছেট মাছ, শামুক, জলজ উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দানাশস্য ও কীটপতঙ্গ নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। হাঁস সকালবেলায় ডিম পাড়ে। তাই এই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সময় ডিমপাড়া হাঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘরে আবন্ধ করে রাখতে হবে। আমাদের দেশের যেসব অঞ্চলে পতিত জমি, হাওর-বাঁওড় ও নদী রয়েছে সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উন্নত ও লাভজনক। কিন্তু উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- শ্রমিক কম লাগে
- খাদ্য খরচ কম
- বাসস্থান তৈরিতে খরচ কম হয়
- পরিবেশের সাথে অভিযোগন ভালো হয়
- এদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ভালো হয়



চিত্র : উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

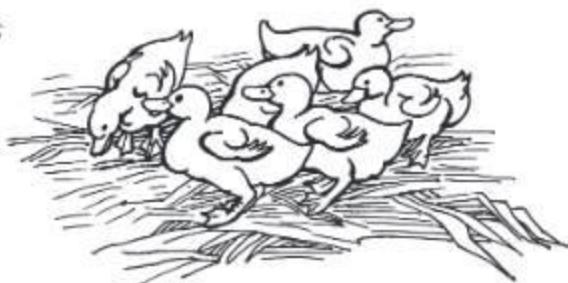
- অনেক পতিত জমি ও জলমহলের প্রয়োজন হয়
- বন্য পশুপাখি দ্বারা হাঁসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে
- অনেক সময় খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হয়ে থাকে
- সব সময় পর্যবেক্ষণ করা যায় না
- অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে থাকে

২। আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসকে সব সময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

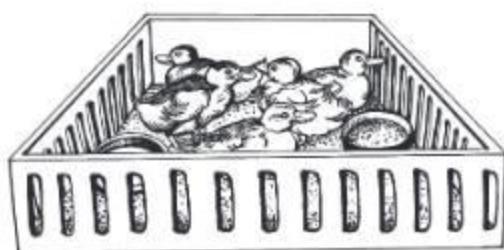
i) মেঝে পদ্ধতি ii) খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি

i) মেঝে পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে বিছানা হিসাবে খড়ের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে বিছানা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

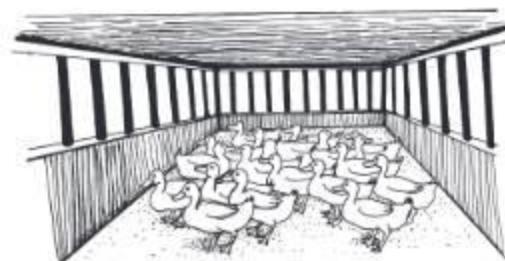


চিত্র : মেঝেতে হাঁসের বাচ্চা পালন

ii) ব্যাটারি বা খাঁচা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।



চিত্র : খাঁচায় হাঁসের বাচ্চা



চিত্র : আবদ্ধ পদ্ধতিতে বয়স্ক হাঁস পালন

আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

- খাদ্য গ্রহণ সম্ভাবনে হয়
- সহজে রোগ প্রতিরোধ করা যায়
- শ্রমিক কর লাগে
- বন্য পশুপাখি হাঁসের ক্ষতি করতে পারে না
- প্রতিটি হাঁসের জায়গা কর লাগে

আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

- বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়
- ঘর নির্মাণ খরচ বেশি হয়
- হাঁসের মুক্ত আলোবাতাসের অভাব হয়
- নিরিড় যত্ন নিতে হয়
- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায় না

৩। অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতি

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁসকে রাতে ঘরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট জলাধার বা জায়গার মধ্যে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। জায়গাটি জলাধার না হলে হাঁসকে সাঁতার কাটার জন্য কৃত্রিম জলাধার, নালা বা চৌবাচ্চা তৈরি করে দিতে হয়। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে ও খাবার পানি খেতে পারে।

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায়
- দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে
- শ্রমিক কম লাগে
- খাদ্য গ্রহণ সম্ভাবে হয়

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- হাঁস পালন খরচ বেশি
- নিবিড় যত্ন নিতে হয়
- খাদ্য খরচ বেশি
- খাদ্য গ্রহণ সম্ভাবে হয় না



চিত্র : অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি বাড়স্ত ও বয়স্ক হাঁস পালনের উপযোগী। বড় পুরুর, দিঘি বা নদীর কিনারায় পানির উপর হাঁসের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে নির্মাণ খরচ একটু বেশি হলেও খাদ্য খরচ কম। ভাসমান ঘর তৈরির জন্য ঢ্রাম ব্যবহার করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘূরে বেড়ায় এবং রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা থেকানে বন্যা বেশি হয়, সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন খুবই সুবিধাজনক।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

হাঁসকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। হাঁসকে সময়মতো টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। হাঁস ডাক প্রেগ, কলেরা ও পরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগক্রান্ত হাঁসকে গন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

নতুন শব্দ : হাওর-বাঁওড়, ভাসমান পদ্ধতি, অভিযোগন, জলমহল, কৃত্রিম জলাধার, ডাক প্রেগ।

সপ্তম পরিচেছন

শিল্পের কাঁচামাল : কৃষিজ দ্রব্যাদি

কৃষি মানবজাতির বেঁচে থাকার একটি অনন্য নিয়ামত এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি শিল্পের কাঁচামালও জেগান দিয়ে থাকে। আবার গৃহের সৌন্দর্য বৃক্ষের জন্য কাঁচামাল হিসাবে কাঠ, গুল্ম ও ঘাস জাতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। চা, কফি, চিনি, তুলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৃষিজ দ্রব্যাদি ছাড়াও বাঁশ, বেত, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, আম ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কুটির শল্লের উত্থান হচ্ছে বাঁশ-বেতের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার বাঁশ-বেত দ্বারা কীসব জিনিস তৈরি হয়, নারিকেলের ছোবড়া কী উপকারে আসে- আর আম দ্বারা কী ধরনের খাদ্য পণ্য তৈরি হয়। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

আমজাত খাদ্যসামগ্রী ও ব্যবহার

আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে যত ফল আছে তন্মধ্যে স্বাদের দিক থেকে আমের অবস্থান প্রথম। আম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই আম উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদনের দিক থেকে ভারত প্রথম স্থান দখল করে আছে। আর বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই কমবেশি আম জন্মে। তবে বেশি আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো হচ্ছে - বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা। মোট আমের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় উৎপাদন হয়।

কাঁচা আম, পাকা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমের মোরক্বা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচুর, আমসস্তু, পাকা আমের বোতলজাত জুস ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরি হচ্ছে।

নারিকেলজাত দ্রব্য ও ব্যবহার

নারিকেল একটি অর্থকারী ও তেলজাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পৌওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রস্তুতি তৈরি হয়। নারিকেল গাছের পাতা দ্বারা বাঁটাও তৈরি হয়।

নারিকেলের কচি ফলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুস্থাদু এবং পুষ্টিকর। রোগীর পথ্য হিসাবেও ডাবের পানির ব্যবহার হয়। উপকূল অঞ্চলের লোকেরা তরকারিতে নারিকেলের শাস ব্যবহার করেন। আর ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরিতে বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হতে মাথায় দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয়। গ্রিসারিন, সাবান ও অন্যান্য কসমেটিকস তৈরিতেও নারিকেল ব্যবহার করা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া

বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল উৎপাদনের সাথে নারিকেলের ছোবড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে নানা গৃহস্থালি বস্তু তৈরি হয়।

যেমন— খাটের জাজিম, ওয়ালম্যাট, পাপোশ, রশি ইত্যাদি।

শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষি দ্রব্যাদি ব্যবহারের গুরুত্ব

বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার

বাঁশ ধাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গুরুত্বপূর্ণ অকাঠ বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাঁশকে পারিবারিক বা গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। গৃহনির্মাণ ও গৃহসমগ্রী থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাঁশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড, চেউটিন এমনকি প্যানেল পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশ পাতলা করে চেরাই করে চাটাই, ডোল, বীম, আড়, ঘরের খুঁটি, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, টুকরি, ঝুঁড়ি, কুলা, মাছ ধরার খাঁচা, পলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।



চিত্র : নারিকেলের ছোবড়া



চিত্র : বাঁশ

আধুনিক বিশ্বে দেশে ও বিদেশে বাঁশের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রভৃতি উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বাঁশ থেকে স্বাস্থ্যকর লেমিনেটেড বাঁশের মেঝে ও দেয়ালকভার, মাদুর, কুশন, সিটকভার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব হচ্ছে।

বাঁশ শিল্পের শ্রেণি বিভাগ

বাঁশ শিল্পকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা :

- ১। কাগজশিল্প
- ২। নির্মাণশিল্প
- ৩। শুল্ক হস্তশিল্প

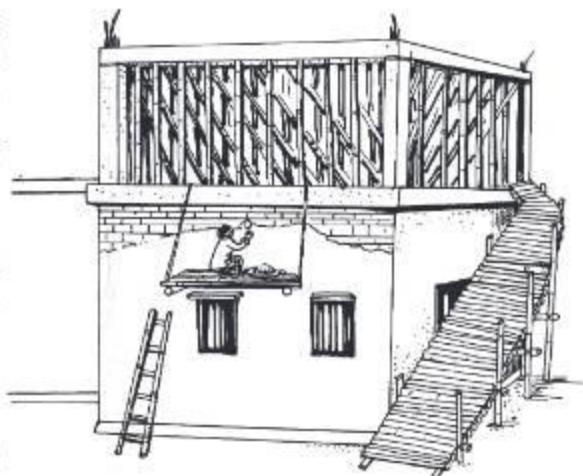
কাগজশিল্প

মুলিবাঁশ কাগজশিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। মুলিবাঁশের তৈরি কাগজের মণ দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপজাত হিসাবে রেয়নও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় কাগজশিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঁশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়াও বাঁশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড, ফ্লেকবোর্ড, বাঁশের চেউটিন, প্যানেল বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নির্মাণশিল্প

বিভিন্ন নির্মাণশিল্পেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণশিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজ যেমন খুঁটি দেওয়া, ঘরের বেড়া দেওয়া, বীম বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

আরও অনেক নির্মাণশিল্প যেখানে বাঁশ অতীতকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন গ্রামের খাল বা অগ্রশস্ত নদীতে সেতু বা সঁকো তৈরিতে, নৌকার মান্তল, ছই, পাটাতন, গরুর গাড়ি, ঢেলাগাড়ি, জোয়াল, ধানি ও মাড়াই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুঁটি, মাছ ধরার চাঁই, খাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জালের দঙ্গ, সবজির গাছ বেয়ে ওঠার জন্য মাচা, নৌকার হাল ও দাঁড়ের দঙ্গ, বক্তৃতার মঞ্চ, তোরণ এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ ধারা কৃপ তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় আর্টেজীয় কৃপ। এই কৃপের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকায় জমি চাষ করা হয়।



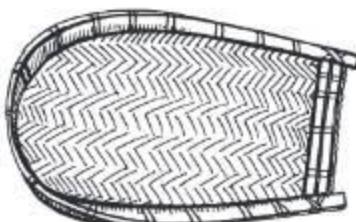
চিত্র : দালানকোঠা নির্মাণে বাঁশ

সুন্দর হস্তশিল্প

সুন্দর হস্তশিল্পেই অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের দ্রব্যজাত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকার বাঁশ বয়ন সুন্দর হস্তশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, ডোল, কুলা, ঝুড়ি, ঝাকা, চালনি, খাচা, খেলনা, কলম, টুপি, ফুলদানি, লাইট স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠি এমনকি দাঁত খিলান, বুকসেলফ ইত্যাদি।



চিত্র : টুকরি



চিত্র : কুলা



চিত্র : পলো



ঔষধি বাঁশ

চিত্র : বাঁশের চেয়ার ও সোফা

বাঁশ শুধু কাগজ তৈরি বা গৃহসামগ্ৰী তৈরিৰ কাজেই ব্যবহাৰ হয় না। ঔষধ তৈরিৰ কাজেও বাঁশ ব্যবহাৰ হয়। বাঁশের অনেক জাত আছে। তন্মধ্যে সোনালি বাঁশ বিভিন্ন রোগেৰ কাজে লাগে, কাশি, শোথ রোগ, অস্ত্রবজনিত রোগ, ফোড়া পাকা ইত্যাদি মানুষেৰ সাধাৰণ রোগ। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়াৰ মহৌষধ হচ্ছে এই সোনালি বাঁশ। ঔষধ হিসেবে বাঁশেৰ শীষ, পাতা ও মূল ব্যবহাৰ কৰা হয়। অবশ্যই এগুলো কবিৱাজেৰ পৰমৰ্শমতো ঔষধ তৈরি ও ব্যবহাৰ কৰতে হবে।

কাজ : শিক্ষাধীনা যেখানে ঝুড়ি তৈরি কৰা হয় এমন স্থান পরিদৰ্শন কৰবে এবং ঝুড়ি তৈরিৰ ধাপগুলো লিখে আনবে। পৰবৰ্তীতে হাতে কলমে নিজেৱা কৰবে।

বেত ও বেতেৰ ব্যবহাৰ

বেত কাঠ ও বাঁশেৰ মতো প্ৰাকৃতিক বনজ সম্পদ। বাংলাদেশেৰ বনে জঙ্গলে অনেক ধৰনেৰ বেত পাওয়া যায়। বেত উৎপাদনেৰ জন্য কৃষি ভূমি ব্যবহাৰ কৰা হয় না। সিলেট ও পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম অঞ্চলে প্ৰাকৃতিকভাৱেই প্ৰচুৰ বেত উৎপন্ন হয়। বেত, তাল ও নারিকেল গোত্ৰীয় কিন্তু কঁটাযুক্ত লতা ও গুলুজাতীয় উত্তিদ। এৱ ফল হয়। যা বেত ফল নামে পৱিচিত।



বেত শিঙ্গ

বেতেৰ শিঙ্গাঞ্চলেৰ জন্যই বেত সবাৰ নিকট সুপৰিচিত। বেতেৰ কাণ বেত শিঙ্গে ব্যবহাৰ কৰা হয়। বেতেৰ কাণ শক্ত বটে কিন্তু নমনীয় ও চেৱাইযোগ্য। এ থেকে আকৰ্ষণীয় ও আভিজাত্যবহনকাৱী শিঙ্গদ্রব্য প্ৰস্তুত কৰা হয়।

বেতেৰ ফাৰ্নিচাৰ তৈৰি

বেতেৰ তৈৰি ফাৰ্নিচাৰ একেবাৱেই প্ৰাকৃতিক। এতে কোনো প্ৰকাৰ কৃতিমতা নেই। বেতকে সুতাৰ মতো ব্যবহাৰ কৰে কোনো শক্ত জিনিসেৰ (ৱড়, বাঁশ) উপৰ পেঁচিয়ে ফাৰ্নিচাৰ তৈৰি কৰা যায়। আবাৰ বেতেৰ মোটা শাখা-প্ৰশাখা শুকিয়ে শোধন কৰে শক্ত কাঠামো দাঁড় কৰিয়ে সোফা, চেয়াৰ, টেবিল, বুকসেলফ, খাটি, দোলনা, মোড়া, জুতা রাখাৰ তাক, কৰ্মাৰ সেলফ, ওয়াৰ্ড্‌ড্ৰোবস, রকিং চেয়াৰ, আৱাম কেদোৱা ইত্যাদি ফাৰ্নিচাৰ বা আসবাৰপত্ৰ তৈৰি কৰা যায়।

ফার্নিচার তৈরির আগে বেতগুলোকে সাইজমতো কেটে শোধন করতে হবে। একটি চাড়িতে আনুমানিক হারে বরিক এসিড ও পানির দ্রবণ তৈরি করে এই দ্রবণে বেত এক সঞ্চাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে ঘুণ বা অন্যান্য পোকা-মাকড় আক্রমণ করবে না।

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই হচ্ছে গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১। হালকা নির্মাণশিল্প

৩। কুন্দ হস্তশিল্প

২। বুনশিল্প

৪। মিশ্রশিল্প

হালকা নির্মাণশিল্প

বেতের হালকা নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় মোটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা ভার বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণশিল্পের প্রধান উদাহরণ হচ্ছে - সোফাসেট, চেয়ার, খাট, পার্টিশন, শেলফ, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পে যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমাণে বেশি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প নৈপুণ্যের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণশিল্পের দ্রব্যাদির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত গোল্লাবেত, উদমবেত, কদমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : বেতের সোফা সেট

বুনশিল্প

বুনশিল্পে সরু ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেরাই করে আরও সরু ফালি পাওয়া যায়। এই সরু ফালিকে বেতি বলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেতি ব্যবহার করা হয়। বুনশিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণশিল্পকে কারুকার্যময় ও নান্দনিক করা হয়। বুনশিল্পের জন্য বান্দরিবেত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

কুন্দ হস্তশিল্প

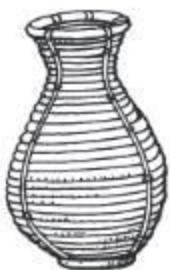
বস্তুত বেতশিল্পের পুরোটাই হস্তশিল্প - কুন্দ হোক অথবা বড় হোক। নির্মাণশিল্প ও বুনশিল্পের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে সৌন্দর্যবর্ধক যেসব দ্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাকেই বলে বেতের কুন্দ হস্তশিল্প। বেতের কুন্দ হস্তশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে খেলনা, ফুলের সাজি, কলমদানি, বেতের ধামা, জুতার র্যাক, মোড়া, ফুলদানি ইত্যাদি।



চিত্র : বেতের ধামা

মিশ্রশিল্প

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক, নাইলন, সিল ইত্যাদি মিশ্রণ করে যেসব দ্রবাদি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। মোটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্রশিল্প হিসাবে দোলনা, মোড়া, র্যাক, সেলফ, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার সরু বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্লাস্টিকের বেতি মোটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খাট, বাক্স, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



চিত্র : ফুলদানি



চিত্র : ফুলের সাজি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ওষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

ওষধি উদ্ভিদ

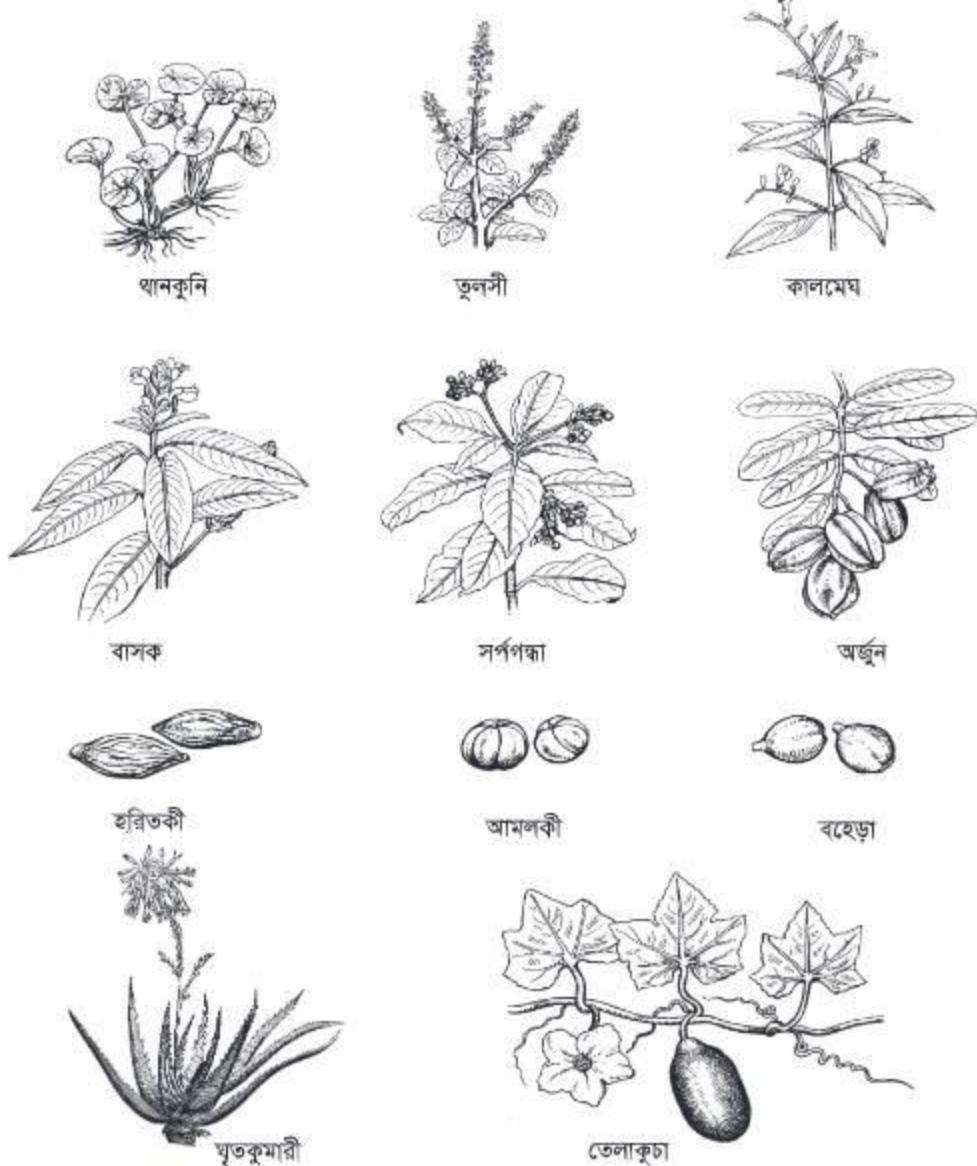
আমাদের চারপাশের পরিবেশে হরেক রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। প্রাচীন জীবনে আমরা বহুবিধ উপায়ে এসব উদ্ভিদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের সকল চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা বিশাল উদ্ভিদরাজির উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা দেখেছি বা শুনেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোটদের সর্দি-কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এর ফলে তাদের সর্দি-কাশি উপশম হয় এবং তারা আরাম পায়। হঠাৎ করে কারও শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে গাঁদা ফুলের পাতা বা দুর্বাঘাস ভালো করে ধূঁয়ে শীলপাটায় বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে পরিবেশের যেসব উদ্ভিদ আমাদের রোগ ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ে ব্যবহার হয়, সেগুলোকেই ওষধি উদ্ভিদ বলা হয়।

ওষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ

আমাদের দেশ এক সময় ওষধি উদ্ভিদে সমৃদ্ধ ছিল। মাঠ-ঘাট, পথ-পাত্র, বন-জঙ্গল সর্বত্র অসংখ্য ওষধি উদ্ভিদে ভরপুর ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমির বহুবিধ ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া অজ্ঞতা, অবহেলা ও অবচেতনের কারণে বর্তমানে এসব ওষধি উদ্ভিদের প্রধান উৎপন্নিত্বল প্রাকৃতিক উৎস বনভূমি কমে যাওয়ায় ঐসব মূল্যবান বৃক্ষ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। এখনও আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে যথেষ্ট ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলো আমরা চিনি না। এমনকি সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। চারপাশের এসব ঔষধি উদ্ভিদসমূহ শনাক্ত করতে পারা এবং সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশের জনসাধারণের রোগব্যাধি নিরাময়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারব।

ঔষধি উদ্ভিদ



কাজ : শিক্ষক নমুনা ঔষধি উদ্ভিদ শ্রেণিতে নিয়ে আসবেন, সেগুলো শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদের নামের তালিকা তৈরি করবে।

ঔষধি উত্তিদি ও এর ব্যবহার

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে রোগব্যাধি উপশয়ে বিভিন্ন রকম উত্তিদি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব উত্তিদিকে ঔষধি বা ভেজ উত্তিদি বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি ভেজ উত্তিদের পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

- ১। **থানকুনি :** থানকুনি একটি ছোট লতানো বিরুৎ জাতীয় উত্তিদি। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে মূল এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল বৃক্কের মতো, একান্তর।

ব্যবহার্য অংশ : সমস্ত উত্তিদি

ব্যবহার : ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময়ে থানকুনি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া থানকুনি আয়ুবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমরণ্ত নাশক, চর্মরোগনাশক।

- ২। **তুলসী :** তুলসী অতিপরিচিত বিরুৎ জাতীয় উত্তিদি। এটি সাধারণত ৩০ সেমি হতে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ডিমাকার, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েদের তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

- ৩। **কালোমেঘ :** এটি একটি ছোট বিরুৎ জাতীয় উত্তিদি। সাধারণত ২০ সেমি থেকে ১ মিটার উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিতা। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : সমস্ত গাছ, বিশেষ করে পাতা

ব্যবহার : ছোট ছেলে-মেয়েদের জুর, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এর রস একটি অত্যন্ত ভালো ঔষধ।

- ৪। **বাসক :** গুল্মজাতীয় উত্তিদি। পাতা সরল, প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি।

ব্যবহার্য অংশ : পাতার নির্যাস

ব্যবহার : কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস থেলে কার্যকরী হয়।

- ৫। **সর্পগন্ধা :** সর্পগন্ধা একটি বহুবর্ষজীবী বিরুৎ। প্রতিপর্বে সাধারণত গুটি পাতা থাকে। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহার্য অংশ : মূল বা ফলের রস

ব্যবহার : সর্পগন্ধার মূলের বা ফলের রস উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত হয়। পাগলের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

- ৬। **অর্জুন :** অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহদাকৃতির বৃক্ষ। কাণ সরল উন্নত, মস্ত এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল ওঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ডিমাকৃতির। ফুল হলুদাভ শুদ্ধাকৃতির, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ।

ব্যবহার : কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভাগোভাবে বেটে তার রস চিনি ও দুধের সাথে প্রত্যহ সকালে সেবনে যাবতীয় হন্দরোগ আরোগ্য হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। ছালের রস সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপশম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের চূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয়। অর্জুনের ছালের মিহি গুঁড়া মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেচতার দাগ মিলিয়ে যায়।

- ৭। **হরিতকী :** বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃত্তক। ফুল শ্বেতবর্ণ ও ছোট হয়। ফল লম্বাকার হাপকা খাঁজযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ : ফল ও কাঠ

ব্যবহার : আয়ুর্বেদিক ঔষধ ত্রিফলার অন্যতম ফল হরিতকী। হরিতকী ফল চূর্ণ করে একটু লবণ মিশিয়ে সেবন করলে অর্শরোগ নিরাময় হয়। হরিতকী চূর্ণ পাইপে ভরে ধূমপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। যেকোনো ক্ষতে হরিতকী পোড়া ছাইয়ের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়। চিনি ও পানির সাথে হরিতকী চূর্ণ ব্যবহার করলে চোখ ওঠা ভালো হয়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাকাফল রক্তশূণ্যতা, পিণ্ডরোগ, হন্দরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য। ফলচূর্ণ দস্তরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী বলবৃক্ষিকারক, জীবনীশক্তি বৃক্ষিকারক ও বার্ধক্য নিবারক।

- ৮। **আমলকী :** মাঝারি আকারের বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, উপপত্র বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ। ফল রসাল, মাংসল, সবুজ, গোলাকৃতি, মুখরোচক ও উপাদেয়। মার্চ থেকে মে মাসে ফুল আসে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল

ব্যবহার : আমলকী পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক এবং টনিক। ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যক্ষ, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজম ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। আমলকীর ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, জন্তস, চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, চুল পড়া প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

- ৯। **বহেড়া :** এটি একটি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বোঁটা লম্বা। ফুল সবুজাভ সাদা, ডিম্বাকৃতির। ফলে একটি করে বীজ থাকে। ফল গোলাকৃতির বা ইঁধৎ লম্বাটে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল

ব্যবহার : ত্রিফলার অন্যতম ফল বহেড়া। বীজের শোস (বাদামের মতো) দু-একটি করে দুঘণ্টা অন্তর এবং দিনে দুইটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেড়া চূর্ণ সকাল-বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। ফল পেটের পীড়া, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৎপিণ্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাণ্ড তেল মাথা ঠান্ডা রাখে এবং চুল পড়া বন্ধ করে।

১০। ঘৃত কুমারী : বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লম্বা, কিনারা খাঁজ কাটা, রসাল।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিছিল রস।

ব্যবহার : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিছিল রস কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসূ ঔষধ। এটি ফুর্ধামন্দা, জঙ্গিস, লিউকোমিয়া, অর্শরোগ, কাটা-পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ অবদান রাখে। প্রসাধন দ্রব্যে এর মিশ্রণে প্রসাধনের মান উন্নত হয়।

১১। তেলাকুচা : এটি লতানো বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বনবাদাড়ে আপনা-আপনি এ গাছ, জন্মাতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাণ্ড ও পাতা

ব্যবহার : এ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার নির্যাস ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এর নির্যাস সর্দি, জ্বর, হাপানি ও মুর্ছারোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এর পাতা বাটার প্রলেপ বেশ উপকারী।

কাজ : ঔষধি উদ্ভিদের নাম ও ব্যবহার নিয়ে দলীয় আলোচনা উপস্থাপন করো।

ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোগ নিরাময় উপশমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির পিছনে ঔষধি উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের নিকট ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময় খুবই জনপ্রিয়। কারণ ঔষধি উদ্ভিদের চিকিৎসাব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা এবং তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এ কারণে বর্তমানে ঔষধি গুণসম্পন্ন আয়ুর্বেদী ও ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থাও আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষ চরমে পৌছালেও মানুষ আবার সেই প্রাচীন ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্য করছে। পৃথিবীর বহুদেশ ভেষজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষধশিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

কাজ : ‘রোগ নিরাময়ে ঔষধি গাছগালা’ এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পোকা ধানের দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে?

ক. মাজরা পোকা

খ. পামরি পোকা

গ. গাঙ্কি পোকা

ঘ. চুঙ্গী পোকা

২. গাজী ধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i. গাছ খাটো হয়।

ii. পাতা হেলানো থাকে

iii. ফলন বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. কোনটি পাটের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ?

ক. কাণ্ডে কালো বেষ্টনীর মতো দাগ থাকে।

খ. কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ হয়।

গ. আক্রান্ত স্থান ফেঁটে যায়।

ঘ. কাণ্ডে কালচে দাগ হয়।

নিচের উদ্বীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি মিয়া একজন পাট চাষি। তিনি এ বছর তার দুই খণ্ড জমিতে সিসি-৪৫ ও চিন সুরা গ্রিন জাতের পাটের চাষ করেন। তিনি সিসি-৪৫ জাতের পাট আঘাত মাসে ও চিন সুরা গ্রিন জাতের পাট ভদ্র মাসে কাটেন। তিনি প্রতি খণ্ড থেকে ১৫০০টি করে আঁটি পান। পাট জাগ দেওয়ার সময় তিনি ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন।

৪. তাসফি মিয়া দুই খণ্ড জমির পাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাটার কারণ -

- ফসলের পরিপন্থতা ভিন্নতা হওয়ায়
- জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য
- ফসলের জাতের ভিন্নতা থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. তাসফি মিয়ার পাট পচানোর জন্য কত কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন?

ক. ১৫ কেজি

খ. ২০ কেজি

গ. ২৫ কেজি

ঘ. ৩০ কেজি

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আয়শা বেগম বিল অঞ্চলে উচুভিটে বাড়িতে বসবাস করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সর্বজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ির আঙিনায় ৫ শতক জমিতে পালংশাক চাষ করে সফলতা লাভ করলেন। এ সফলতার পর তিনি বিলে অবস্থিত তার জমিগুলোর উচু আইলেও পালংশাক চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

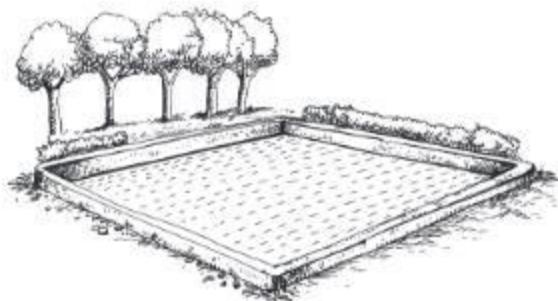
ক. পালংশাকের একটি জাতের নাম গেথো।

খ. পালংশাক চাষে ‘ইউরিয়া সার’ উপরি প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করো।

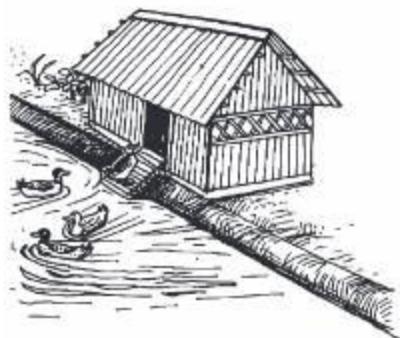
গ. আয়শা বেগম জমিতে কী পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করেছিলেন নির্ণয় করো।

ঘ. আয়শা বেগমের পরিকল্পনা তাঁর কৃষি কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ করো।

২.



চিত্র - ক



চিত্র - খ

- ক. সমন্বিত চাষ কাকে বলে ?
- খ. সমন্বিত চাষে ভূমির ব্যবহার দিগ্ন হয় কীভাবে ? ব্যাখ্যা করো ।
- গ. চিত্র ক ও খ-এ উল্লিখিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটির উৎপাদন খরচ কম কারণ ব্যাখ্যা করো ।
- ঘ. পরিবারের আয় ও পুষ্টি বৃদ্ধিতে চিত্রে উল্লিখিত কোন পদ্ধতিটি উন্নম-যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো ।
৩. মেঘনার তীরের বাসিন্দা কৃষক তোরাব তার দুই একর জমিতে পাট চাষ করলেন । কিছুদিন পর তার পাটের জমিতে শুয়োযুক্ত এক ধরনের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হলো । তোরাব বিচলিত না হয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকা দমন করলেন । ফলে তার জমিতে পাটের আশাতীত উৎপাদন হওয়ায় পরবর্তী বছর এলাকার অন্যান্য কৃষকরা তাদের জমিতেও পাট চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ।
- ক. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?
- খ. স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও পাটের বীজ বেশি বোনার কারণ ব্যাখ্যা করো ।
- গ. কৃষক তোরাব আলীর জমিতে পোকা দমন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো ।
- ঘ. কৃষকদের সিদ্ধান্ত ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু সুফল বয়ে আনবে তা মূল্যায়ন করো ।